ঝলমল
প্রথম বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা
কার্তিক ১৩৮৫

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি এবং স্ক্যান করে দিয়েছেন শুভজিত কুণ্ড

এডিট করেছেন সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcybertron@gmail.com

। সরকারের
হাসিখুসি প্রথম ভাগের মতই প্রকাশিত হল
নতুন পরিমাজে, নতুন রঙীন ছবিতে
হাসিখুসি দ্বিতীয় ভাগ—২.৫০
মনোলোভা ছড়ার নতুনরূপ— ছড়া পড়তে গিয়ে
অজান্তে শিখে ফেলবে যুক্তাক্ষর যেমনঃ

"মত্ত হলেন
ব্যাঘ্র মশাই
গ্রামের মাঝে এসে"
অথবা
"শ্বশুরবাড়ি
গিয়ে বিশে
হল বিশ্বনাথ"
যোগীন্দ্রনাথ সরকারের আরো বই:
হাসিখুসি প্রথম ভাগ ২.৫০
হাসিরাশি ৪.০০
আমাদের ছবি অথবা জানোয়ারের মেলা
৩.০০
...য়ন — ২.৫০
...রত — ৪.০০
* * * * * * * * * * * *
...মত্রের লেখা
...ছব — ৩.০০
...ও মিত্র
লিমিটেড
কলকাতা-১২

তথ্যসমৃদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য
মেজর জেনারেল শাহ-নওয়াজ খান
আজাদ হিন্দ ফৌজ ও নেতাজী

অমৃতলাল গুপ্ত
আয়ুর্বেদ-শিক্ষা

সন্তদাস গিরি মহারাজ
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

BOSE & STERLING'S
RHETORIC & PROSODY
Text-book for Degree Hons. Students)

Sen & Sen.
SCHOOL ESSAYS & LETTERS

JOHN CAIRD
An Introduction to PHILOSOPHY

চক্রবর্তী, চ্যাটার্জী এণ্ড কোং লিঃ
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-৭০০০০৭
ফোন : ৩৪-১১৩৪

ভারতের দুঃখ দুর্দশা সুভাষকে ভাবিত করে তুললো। এর মধ্যে আই সি এস. পরীক্ষায়ও সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয় সুভাষচন্দ্র।
এবার ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে দেশে ফিরবে সুভাষ। বিলেতে বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে আনন্দের সাড়া পড়ে যায়।
সুভাষ,এবার তুমি তো একটা জাঁদরেল লোক হয়ে গেলে।
কেন, আমার পিঠে পাখা গজালো নাকি?
তা নয় তো কি? আই সি এস.-এর চাকরি কি সহজ কথা?
আমি যদি চাকরি ছেড়ে দি ?
সেকি! চাকরি ছেড়ে দেবে?
হ্যাঁ, চাকরি ছেড়ে দিয়ে দেশের কাজ করবো।
কেন, আই সি এস. হয়ে কি দেশের কাজ করা যায় না ? এমন কাজ করো না সুভাষ।
না, কোন কিছুর জন্যই আমি প্রতারণার আশ্রয় নিতে চাই না। ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করবো অথচ তাদের কৃপার অনুগ্রাহী হবো, তা হতে পারে না।
সুভাষ আই সি এস. চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে ভারতে ফিরে আসে। এবং সোজা চলে যায় মহাত্মা গান্ধীর কাছে।
তুমি আই সি এস. ত্যাগ করে চলে এলে?
হ্যাঁ, আমি দেশের কাজ করতে চাই। আপনার আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে চাই।

খুব ভাল কথা। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি।
আমি আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। আপনি কি মনে করেন, শক্তিশালী ইংরাজদের হাত থেকে অহিংস আন্দোলন দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা কেড়ে আনতে পারবেন?
শোন, ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করার মতো যথেষ্ট অস্ত্র আমাদের নেই। তাই অহিংসাই আমাদের একমাত্র হাতিয়ার।
আমার মনে হয়, এই অহিংস অস্ত্রের ভয়ে দুর্ধর্ষ ইংরাজ কখনই এ দেশ ছেড়ে যাবে না।
শোন, তুমি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কাছে যাও। তিনি তোমাকে সঠিক নির্দেশ দেবেন।
সুভাষ কলকাতায় পৌঁছে নিজের বাড়িতে না গিয়ে একেবারে চিত্তরঞ্জনের বাড়ি গিয়ে হাজির হয়
আমি আপনার কাছে এসেছি। আপনি আমার গুরু। আমাকে পথ নির্দেশ দিন।
নিশ্চয়ই দেবো। তোমার মত একজন লোককেই আমি খুঁজছিলাম।
দেশবন্ধু সুভাষচন্দ্রকে দিলেন কাজের নির্দেশ
প্রথমে বিলাতী দ্রব্য বর্জন
যে চিত্তরঞ্জন বিদেশ থেকে নিজের জামাকাপড় ধোলাই করে আনতেন, তিনি গায়ে তুলে নিলেন খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবি সুভাষও তুলে নেয় ঐ খদ্দর, রাজা হলো সন্ন্যাসী।
যার কাছে যত বিদেশী বস্ত্র ছিল সব এক জায়গায় জড়ো করে তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল। শুরু হল বিদেশী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব।

[ক্রমশঃ]

সূচীপত্র

ঝলমল

শিশু ও কিশোরদের সচিত্র মাসিকপত্র
কার্ত্তিক, ১৩৮৫

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	মহাজীবন (চিত্রে অমর কাহিনী) দিলীপ দাস	১
২।	ময়দানবের দবীপ (রহস্য চিত্রকাহিনী) গৌতম কর্মকার	৪
৩।	আমাদের দেশবন্ধু	৫
৪।	সরষে ভূত (কবিতা) সরল দে	৬
৫।	খুকু ও কাঠবেড়ালী (কবিতা) সুলেখা ঘোষ	৬
৬।	শেখ আলির অতিথি (গল্প) শ্যামলী বসু	৯
৭।	দেশ দেশান্তর : মল্লিকা মুখোপাধ্যায়	১১
৮।	উল্কার কথা : ননীগোপাল আইচ	১২
৯।	কাইয়্যাক ও উমিয়্যাক : মিতালী বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩
১০।	নারদমুনি নাজেহাল (পৌরাণিক গল্প) অনিল মিত্র	১৪
১১।	জলছবি (ছড়া) হর দত্ত	১৬
১২।	যযাতি (বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্প) ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য	১৭
১৩।	আমার ইচ্ছে (ছড়া) কালিদাস ভট্টাচার্য	২৩
১৪।	আকাশে বাতাসে (ছড়া) অজিত কুমার দাস	২৩
১৫।	অনির কুকুর (গল্প) বিজন কুমার ঘোষ	২৪
১৬।	সঙ্গীত ও শরৎচন্দ্র : শৈলেন কুমার দত্ত	২৫
১৭।	স্নেহের মূল্য (গল্প) রত্নমাণিক দাস	২৬
১৮।	বাংলার ডাকাত (গল্প) ডাঃ শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	২৭
১৯।	নেপোলিয়নের ছেলেবেলা : কালিপদ হোড়	৩২
২০।	মনুমেন্ট, জাদুঘর ও চিড়িয়াখানা	৩২
২১।	মৃত্যুগুহার বন্দী (ধারাবাহিক উপন্যাস) রবিদাস সাহারায়	৩৩
২২।	গিলগামেশের গল্প : পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য	৩৭
২৩।	গুপ্তচরের স্বদেশপ্রীতি	৩৮
২৪।	কে বড় (গল্প) লক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য	৩৯
২৫।	গণেশ বাবাজী : সুলতা রায়	৪১
২৬।	রত্নাকর জন্মদিনে (গল্প) মীরা বালসুব্রহ্মনিয়াম	৪২
২৭।	গাছ পোকামাকড় খায় : নিখিলমণ্ডল চট্টোপাধ্যায়	৪৬
২৮।	স্বপনবুড়োর চিঠি	৪৭
২৯।	পিগমি আর টুগমি (ধাঁধার গল্প) রত্নাকর	৪৮
৩০।	জেব (ছড়া) দেবরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়	৫০
৩১।	বিদেশী ভারতপ্রেমিক ডেভিড হেয়ার পিনাকীরঞ্জন কর্মকার	৫১
৩২।	কর্কট বিভ্রাট : লতিকা চট্টোপাধ্যায়	৫৩
৩৩।	নরমুন্ড শিকারীর দেশে টারজান (অ্যাডভেঞ্চার) ভাস্কর	৫৪
৩৪।	ফুটবলের শুরু কেমন করে : শচীন কুন্ডু	৫৭
৩৫।	ঘরোয়া মেজাজে প্রশান্ত সিনহা : সৌমিত্র ঘোষ দস্তিদার	৫৮
৩৬।	মুষ্টি যুদ্ধে অদিবতীয় মহম্মদ আলি : রবীন ব্যানার্জী	৬১
৩৭।	নতুনদের আসর : গল্প : লীনা সরকার, কবিতা : সুচরিতা সেনগুপ্তা	৬২
৩৮।	পারিজাতমালার গল্প (রূপকথা) প্রদোষ দত্ত	৬৩
৩৯।	মজার ধাঁধা	৬৪

শ্রীসিতাংশুশেখর ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রগতি প্রিন্টার্স, ৭৫, বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত এবং পি ৪৬, নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, কলি-৭০০০৫৪ হইতে প্রকাশিত।
মূল্য : ১'২৫

দানবের দ্বীপ (পূর্ব প্রকাশিতের পর) কাহিনী ও চিত্রণে—গৌতম কর্মকার

[পরবর্তী অংশ ৭ম পৃষ্ঠার]

প্রথম বর্ষ | কার্তিক, ১৩৮৫ | সপ্তম সংখ্যা

আমাদের দেশবন্ধু

স্কুলে টিফিনের ছুটি হয়েছে। হৈ হৈ করে ছাত্ররা বেরিয়ে পড়েছে মাঠে। ফুটফুটে চেহারার ছেলেটিও সহপাঠীদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছে। ছেলেটি দেখতে শুনতে যেমন ভালো, পড়াশোনায়ও খুব ভালো। তার ওপর বড়লোকের ছেলে। তাই অনেকে তাকে সমীহ করে চলে। বড়লোক বলে ছেলেটির মনে কিন্তু কোন অহঙ্কার নেই। সে সবাইকে ডেকে নিয়ে যায় মাঠের এক ধারে—যেখানে খাবার নিয়ে বসেছে সব ফেরিওয়ালারা। যে যা খেতে চায় তাই তাকে সে খাওয়ায়।

কিন্তু মুস্কিল হয়, বড্ড শীগগীর পকেটের পয়সা শেষ হয়ে যায়। মুখ থেকে বের হয় আপসোসের সুর—যাঃ, সব যে ফুরিয়ে গেল!

কোন কোনদিন নিজে কিছু খাবার আগেই পয়সা ফুরিয়ে যায়। সেজন্য তার মনে কোন দুঃখ নেই, সহপাঠীদের খাইয়েই তার আনন্দ।

স্কুলের পড়া শেষ করে ছেলেটি প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হলো। ফিটন গাড়ি চড়ে সে রোজ কলেজে যায়। ইজের চাপকান পরে গাড়ি থেকে নামে ছেলেটি। অনেকেই বলে, বড়লোকের ছেলে বলে কি ডাট! কিন্তু কিছুদিন পরেই তাদের ভুল ভেঙে যায়। কি সহজ ভাবে সকলের সাথে মিলে মিশে ছেলেটি কথাবার্তা বলে, খেলাধুলো করে। কলেজের ডিবেটিং ক্লাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, আবার সে চালু করলো। নিজে ভালো বক্তৃতা করতে পারে—অন্য সব ছেলেদেরও বক্তৃতা করবার জন্য উৎসাহ দেয়। কত ভালবাসে সহপাঠীদের।

শুধু সহপাঠীদের নয়, দেশের সব মানুষদেরই ভালবাসতেন চিত্তরঞ্জন। তাই বড় হয়ে তিনি হলেন দেশবন্ধু।

বহুগুণে বিভূষিত ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ। তিনি ছিলেন বিখ্যাত ব্যারিস্টার, কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রথম ভারতীয় মেয়র, স্বদেশপ্রেমিক ও দানশীল। দেশের জন্য তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর বিরাট বাসভবনটি চিত্তরঞ্জন সেবাসদন নামে অভিহিত হয়ে দেশের অশেষ কল্যাণ সাধনের কেন্দ্র রূপে তাঁর অতুল কীর্তি ঘোষণা করছে।

জন্ম : ১২৭৭, ২০শে কার্তিক,
১৮৭০, ৫ই নভেম্বর

মৃত্যু : ১৩৩২, ২রা আষাঢ়
১৯২৫, ১৬ই জুন

সর্ষে-ভূত

সরল দে

সর্ষে দিয়ে মাছ রান্না ? কান্না জোড়ে টুনি।
মাছ খাবে না, কিচ্ছুতে না, কিন্তু কেন শুনি ?
কেউ জানে না, জানবে কেন ? আওয়াজ খালি নাকে।
যায় না জানা—যতই ওরা করুক জেরা তাকে।
এই না শুধু, দিন-দুপুরে কাণ্ড হলো কী যে ;
কাঁদলে টুনি নাকের জলে চোখের জলে ভিজে।
ব্যাপারটা কী ? কাঁচের শিশি, সর্ষে ছিল তাতে,
যাও তো নিয়ে পিসির কাছে —মা দিল তার হাতে।
আঁৎকে উঠে লাফায় টুনি—ছিটকে পড়ে শিশি,
ঝন্ ঝন্ ঝন্ শব্দ হতে দৌড়ে আসে পিসি !
কেঁদেই টুনি বলল, ওরে খাবে আমায় ধরে,
ভূত আছে ওর মধ্যে জেঠু বলে কাগজ পড়ে !
কার্য-কারণ ব্যাপার স্যাপার আগা এবং গোড়া
ফাঁস হতে কী হাসির ঘটা—হাসছে কেন ওরা ?
সত্যি কথাই, খবর পড়ে জেঠুই বলে থাকে—
সর্ষেতে ভূত থাকলে বাপু কে আর ধরে কাকে !

খুকু ও কাঠবিড়ালী

সুলেখা ঘোষ

কাঠবিড়ালী, কাঠবিড়ালী
বল না আমায় একটু ভাই,
লোক দেখলেই একছুটেতে
পালাস কেন শুনতে চাই।
ভয় করে তোর বেজায় রকম ?
বল তো দেখি কিসের ভয় ?
মারবে তোকে সবাই মিলে,
তাও কখনো সত্যি হয় ?
চিরিক্ চিরিক্ আওয়াজ তুলে
কিসের নেশায় ছুটিস্ বল ?

ফলসা দেব, পেয়ারা দেব—
নয়তো দেব অন্য ফল'।
বলবি নে তুই তবুও আমায়
করবি নে ভাব মোর সাথে ?
বেশ তো তবে আসবি নে আর
আমার ঘরের জানলাতে ॥
ফের যদি তুই আসিস ছুটে
দেবই তবে কান মলে—
পেয়ারা দেব মনের কথা
আমায় যদি যাস বলে ॥

নিপুণভাবে ওজন করে ছাল-পাতার পরিমান ওষুধ ঠিক করে নিলেন।
খল-নুড়িতে একে একে সেগুলি পিষিয়ে নিলেন তিনি। তারপর নিংড়ে নিলেন সব রস। তৈরী হোলো দৈত্যের দাওয়াই।
GOUTAM
বেলা পড়ে আসছে। আড়ালে আড়ালে এগিয়ে চলেছেন জামাল।
দুধের পাত্রে হেকিমের তৈরী দাওয়াই একে একে মিশিয়ে দেন জামাল।
৭।৭৮
৫২

ভয়ে কাঁপছে হাত-পা... কি জানি কি হয় অবস্থা।
ভয় নেই নাসির, মুস্তাফা, আলিবর্দী—মনে সাহস রাখো। জামাল যখন মুক্ত তখন ব্যবস্থা কিছু একটা হবেই!
ওদিকে গুহার ভিতরে
হুজুর—উনি যদি বেইমানী করেন?
না না, জামাল আমার ছেলে-বেলায় বন্ধু।
চুপ—সব শুয়ে পড়ো!
কিরে পুতুল-সর্দার, কেমন আছিস?

[ক্রমশঃ]

শেখ আলির অতিথি

শ্যামলী বসু

প্রতিদিনের মতো উট, ছাগল ও ভেড়ার পাল চরাতে নিয়ে যাবার সময় আজও তাঁবুর বাইরে এসে আকাশের দিকে তাকিয়ে হতাশ হল মুবারক। 'নাঃ পরিষ্কার আকাশে সূর্য ঝক্ ঝক্ করছে কোথাও মেঘের ছিটে ফোঁটা নেই, তার মানে আর একটি অসহ্য গরম দিন! উঃ আর পারা যায় না।'

তার পিছনে এসে দাঁড়ালেন তার বাবা, হাওয়াইটাট বেদুইন দলের প্রধান, বৃদ্ধ শেখ আলি। ছেলের হতাশ মুখের দিকে তাকিয়ে দুঃখিতভাবে মাথা নাড়লেন শেখ. 'আজও বৃষ্টি হবার আশা নেই।'

'হঠাৎ এ কি হল দেখি? উত্তর সিরিয়ার এই মরুভূমিতে অন্যান্যবার কয়েক মাস অসহ্য গরমের পর নভেম্বর থেকেই বৃষ্টি নামে, এবার মার্চ শেষ হতে চলল কয়েক পশলা বৃষ্টি ছাড়া—বৃষ্টির দেখাই নেই। এদিকে জলের অভাবে, সবুজ ঘাসের অভাবে, ভেড়া ছাগলগুলো ধুঁকছে—বেশ কিছু ছাগল তো মরেই গেছে। হায় আল্লা! এই পশুর পালই তাদের প্রাণ-ধারণের একমাত্র সম্বল! এখন উপোস করে মরা ছাড়া সামনে আর কোনো পথ নেই।'

বেজার মুখে পশুর পাল নিয়ে চরাতে গেল মুবারক, আর চরাবেই বা কোথায়? আছে কি? জল নেই—ঘাস, কাঁটা লতাপাতা কিছুই নেই শুধু শুকনো কাঁটা ঝোপ। বেচারা পশুগুলো যেন চলতেও পারছে না। এমন সময় দূরে পাহাড়ের গায়ে একটা ধূসর রঙের চলন্ত ছায়া দেখে চমকে উঠল মুবারক, সর্বনাশ—নেকড়ে! ভয়ানক! সত্যিই পাহাড়ের নীচে শুকনো কাঁটা ঝোপের পাশে একটা ভেড়ার আধখাওয়া মৃতদেহ পড়ে আছে। এই সময় নেকড়েগুলো সাংঘাতিক ধূর্ত আর শয়তান হয়ে উঠে। একবার ভেড়া, ছাগল ধরা মানে জন্তুটা বারবার পশুর পালে হানা দেবেই, আর অনাহারে শীর্ণ পশুগুলো না পারে দৌড়তে, না পারে বাধা দিতে—সহজেই নেকড়ের শিকার হয় তারা। নাঃ, একটা ব্যবস্থা এখুনি করা দরকার। তাঁবুতে গিয়ে শেখ আলিকে খবরটা দিল মুবারক। বৃদ্ধ শুনেই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন,—

'হায় রে, আবার নতুন উৎপাত! মুবারক শিগ্‌গির যাও, দলের শক্ত সমর্থ পুরুষদের নিয়ে এখুনি নেকড়েটাকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা কর।'

দলের প্রত্যেকটি পুরুষ দুপুরের প্রখর রৌদ্রের মধ্যে পাহাড়ের উপরে, আশে পাশে, গিরিপথের চারদিকে ভালো করে খুঁজেও নেকড়েটার চিহ্নমাত্র খুঁজে পেলেন না। সবাই হতাশ হয়ে এবং উদ্বিগ্ন হয়ে শেখের তাঁবুতে পরামর্শ করতে বসলেন।

দলের মধ্যে সব থেকে রুক্ষ স্বভাব এবং কটুভাষী পুরুষ হল আবদাল্লা। আবদাল্লা শেখ আলিকে বললে, 'এখানে আমরা না খেয়ে মরতে বসেছি; মরতে বসেছে আমাদের পশুরাও; এখানে শুকনো কাঁটাঝোপ আর নেকড়ে ছাড়া আমাদের জন্য আর কিছুই নেই। শেখ, চলুন, আমরা মরুভূমি থেকে নেমে চলে যাই—জর্ডান উপত্যকায়, সেখানে গিয়ে আমরা বাঁচব!'

শেখ আলি চিন্তিতভাবে বললেন, 'না, আবদাল্লা, এখন আর তা হয় না। আমাদের পশুর পাল অনেকদিন জল আর খাবার না পেয়ে এত দুর্বল হয়ে পড়েছে যে দশ বার দিনের পথ তারা চলতেই পারবে না, তা ছাড়া দলের শিশু আর স্ত্রীলোকদের কথাও ভাব, এই অবস্থায় ওদের পক্ষেও এতটা পথ চলা সম্ভব নয়, আর পথেই যদি মরতে হয়—তা হলে নিজের দেশেই মরা ভাল, তাই না?'

এবার কিন্তু রেগে উঠল আবদাল্লা—'বুড়ো হয়ে শেখের ভীমরতি ধরেছে! চোখের সামনে আমরা শুকিয়ে মরি, এই অযোগ্য, অপদার্থ বুড়ো তাই চায়।'

আবদাল্লা চিরকালই কটুভাষী, কিন্তু আজ যেন মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। দলের সবাই চঞ্চল হয়ে উঠলেন; শেখের চোখে আগুন জ্বলেই নিভে গেল, হাতটা অজ্ঞাতেই কোমরে গোঁজা ছোরাটার উপর থেমে গেল। কোনমতে রাগ সামলে শান্ত গলায় শেখ বললেন, 'আবদাল্লা, মরুভূমির আতিথেয়তার আইন বড় কড়া। তাঁবুর অতিথি তুমি, যত অপরাধই কর, যত খারাপ ব্যবহারই কর, তুমি আমার মাননীয়—তোমার অমর্যাদা করতে পারি না, শাস্তিও দেব না। তুমি শান্তিতে চলে যাও।'

যাবার আগে আবার শাসিয়ে গেল আবদাল্লা, কালকের মধ্যে যদি বৃষ্টি না হয়, তা হলে আমার পরিবারের সকলকে নিয়ে জর্ডানে নদীর উপত্যকায় নেমে যাব, দেখবে, যারা তোমার তাঁবুতে এখন বসে আছে, অনেকেই তখন আমার সঙ্গে চলে যাবে, তখন, কে 'শেখ' হবে দলের, জেনে নিও।'

তাঁবুর অতিথিরা বিদায় নিলে। মুবারক উত্তেজিত হয়ে বারবার শেখের এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে চাইল। শেখ ছেলেকে শান্ত করে বলতে লাগলেন, না মুবারক, এমন বিপদের সময় মিছামিছি রক্তপাত করে শত্রুতা বাড়িও না। তা ছাড়া আবদাল্লা যদি চলে যেতে চায়, যাক্ না, ওকে বাদ দিয়েই আমাদের দলের চলে যাবে।

নেকড়েটা সেই রাতে আবার একটা পশু মারল। এবারের শিকার আবদাল্লার একটা ভেড়া। পরদিন ভোরেই শেখের তাঁবুতে ছুটে এল আবদাল্লা। যা মুখে এল বলতে লাগল শেখকে, দলের অন্য লোকেরা কোনরকমে তাকে টেনে নিয়ে গেল।

মুবারক আর শেখ আলি ঘোড়ায় চেপে বেরিয়ে গেলেন নেকড়ের খোঁজে। কিন্তু কোথাও খুঁজে পেলেন না জন্তুটাকে।

দুপুরে ক্লান্তদেহে ফিরে এলেন শেখ আর মুবারক। তাঁবুতে শুয়ে বিশ্রাম করছেন দুজনে, হঠাৎ মুবারক উত্তেজিত হয়ে সোজা হয়ে বসল 'বাবা, বাবা, দেখ, দেখ,'—

দুজনে বিস্ময়ে পাথর হয়ে দেখলেন যে, শীর্ণ ধূসর দেহ, কোনরকমে ধুঁকতে ধুঁকতে এসে ঢুকল শেখের তাঁবুতে, দরজার সামনে জিভ বার করে নেতিয়ে পড়ল সে, সেই অবাঞ্ছিত অতিথিটি আর কেউ নয়, একটা নেকড়ে।

রাইফেলটা তুলে নিল মুবারক, কিন্তু তার হাত চেপে ধরলেন শেখ আলি। 'না, মুবারক, এই জন্তুটি আমাদের তাঁবুর অতিথি—, যাও ওকে জল এনে দাও, রুটি দাও।'

আবদাল্লার প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ল পৃঃ ১১

নেকড়ে এসে শেখের তাঁবুতে আশ্রয় নিয়েছে—, আর শেখ তাকে রুটি জল দিয়ে সেবা করেছেন—এই আশ্চর্য খবর অন্যান্য তাঁবুতেও ছড়িয়ে পড়ল। শুনেই রাইফেল হাতে ছুটে এল আবদাল্লা, তাঁবুর দরজায় তাকে অভ্যর্থনা জানালেন শেখ আবদাল্লা, 'এস আবদাল্লা, একটু কফি খাও আমাদের সঙ্গে।' কঠিন গলায় আবদাল্লা বললে, 'না, কফি চাই না, আমি চাই আমার ভেড়া যে জন্তুটা মেরেছে, তাকে খতম করে দিতে।'

শেখ আলি আবদাল্লার রাইফেলশুদ্ধ হাতটি ধরে শান্ত কঠিন গলায় বললেন, 'আবদাল্লা, ভুলে যেও না, নেকড়ে হলেও এই জন্তু আমার তাঁবুর অতিথি, আমার আশ্রয়ে এসেছে। তুমি বেদুইনের আতিথেয়তার নীতি ভুলে যেও না। এই পশুটিকে এখন আমি প্রাণের বিনিময়েও রক্ষা করতে বাধ্য।

আবদাল্লা বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল। বেদুইনদের অতিথি সম্পর্কে নিয়মকানুন সে জানে বৈকি। তবে একটা নেকাড়ে সম্বন্ধেও সেই নিয়ম খাটবে ?

চুপ করে ফিরে এল আবদাল্লা নিজের তাঁবুতে। রাগে টলতে টলতে বলল, আচ্ছা, ঠিক আছে, এই আমিও বসলাম তাঁবুর মুখে, রাইফেল হাতে, যেই নেকড়েটা বেরোবে—দফারফা করে ছাড়ব।

জলরুটি খেয়ে সন্ধ্যার দিকে বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠল নেকড়েটা। সারা শরীরটা ঝাঁকুনি দিয়ে বাবিয়ে, আস্তে আস্তে তাঁবুর দরজার কাছে এসে দাঁড়াল ; সন্দেহের সঙ্গে মুখ বাড়িয়ে এদিক ওদিক দেখে নিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল নেকড়েটা।

এই মুহূর্তটির জন্যই অপেক্ষা করছিল আবদাল্লা। নিঃশব্দে সেও বেরিয়ে এসে অনুসরণ করল জন্তুটাকে। তাঁবুর সীমানার বাইরে এসেই রাইফেলের ট্রিগার টিপল, সঙ্গে সঙ্গে নেকড়েটা মুখ থুবড়ে পড়ল মাটিতে।

পিছন থেকে বজ্রকঠিনকণ্ঠে কে যেন ডাকল, 'আবদাল্লা—'

ভয়ে চমকে উঠে আবদাল্লা দেখল ঠিক তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন শেখ আলি—রাগে তাঁর চোখ জ্বলছে, হাতের রাইফেল তার দিকেই তাক করা ঃ 'আবদাল্লা' কঠিন গলায় শেখ আলি বললেন, 'তুমি বারণ করা সত্ত্বেও আমার তাঁবুর অতিথিকে মেরে ফেলেছ, এর শাস্তি তোমাকে আমার দিতেই হবে।'

একটিমাত্র গুলির শব্দ—আবদাল্লার প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ল নেকড়েটার মৃত দেহের পাশেই।*

*বিদেশী পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে লেখা।

দেশ-দেশান্তর

আইভরি কোস্ট

মল্লিকা মুখোপাধ্যায়

আইভরি কোস্ট (Ivory Coast) পশ্চিম আফ্রিকার একটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র—লাইবেরিয়া, গিনি, মালি, আপার ভোল্টা ও ঘানার মধ্যে অবস্থিত। আয়তন ৩,২২,৪৬৩ বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা ৬৬,৭৩,০১৩ (১৯৭৫ খ্রী.)। রাজধানী আবিদজান—লোকসংখ্যা ৮,৫০,০০০ (১৯৭৬ খ্রী.)। অধিবাসীদের শতকরা ২৩.৫ জন মুসলমান, ১২.৫ জন খ্রীষ্টান, ৬৫ জন প্রকৃতি-উপাসক। সরকারী ভাষা ফরাসী।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ৪,৬৪,৮১৭ (১৯৭০ খ্রী.), মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৫৪,৮৩৮ (১৯৭০ খ্রী.)। ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে আবিদজান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ছিল ৩৪০০ জন।

আইভরি কোস্টে প্রায় ১৫ হাজার শ্বেতাঙ্গের বাস। তন্মধ্যে বেশির ভাগই ফরাসী।

ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রথমে চতুর্দশ শতাব্দীতে পোর্তুগিজরা এদেশে আসে। ১৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীরা এখানে উপনিবেশ গড়ে তোলে। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে এই দেশকে ফরাসী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এলাকা বলে ঘোষণা করা হয়। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট আইভরি কোস্ট স্বাধীন হয় এবং ২০শে সেপ্টেম্বর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সভ্য হয়।

আইভরি কোস্ট কৃষিপ্রধান দেশ। যে-সব জিনিস রপ্তানি হয়, সে-সবের মধ্যে কফিই প্রধান। কোকো, ভুট্টা, মিষ্টি আলু, কলা, তুলা প্রভৃতি উৎপন্ন দ্রব্য। খনিজ পদার্থের মধ্যে প্রধান ম্যাঙ্গানিজ। ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ২,৯৯,৭০৮ ক্যারাট হীরা পাওয়া গেছে।

———

উল্কার কথা

ননীগোপাল আইচ

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি। দোতলার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। সঙ্গে ছিলেন ঔপন্যাসিক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও কবি সুনির্মল বসু। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটা ইজিচেয়ারে বসেছিলেন। আলো নেভানো। তাঁকে বললাম, সাহাপুরের একটা সভায় তিনি যদি সভাপতিত্ব করেন তা হলে খুব ভালো হয়। তিনি জানালেন, তাঁর শরীর অপটু, তিনি যেতে পারবেন না।

হঠাৎ তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, কে আছিস্, দেখ্ তো। উল্কাটা হয়তো উঠোনেই পড়েছে। একটা উল্কাকে আলোর রেখা টেনে পড়তে দেখে তিনি এই কথা বলেছিলেন। কেউ সেই উল্কার খোঁজ করেছিল কিনা তা আমার জানা নেই। তবে সেই থেকে মাথায় খেয়াল চাপল, উল্কা খুঁজে বার করার চেষ্টা করতে হবে।

এখন যেখানে নিউ আলিপুর, অসংখ্য বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে তখন ছিল জনহীন বিস্তীর্ণ মাঠ। কত রাত সেই মাঠে একলা ঘুরে বেড়িয়েছি। দৈবাৎ এক আধটা উল্কা পড়তে দেখেছি। কিন্তু সে সব উল্কার খোঁজ পাই নি।

এক রাত্রে স্পষ্ট দেখলাম, একটা উল্কা সাহাপুরের জানকীবাবুর বাগানে পড়ল। বাগানের পাশে দুয়ো সতীনের জলা। বাগানটায় একটা টিনের বাড়ি আছে। লোকজন বাস করে না। ভূতের ভয়ে রাত্রে সেদিকে কেউ যায় না। আমিও গেলাম না।

পরের দিন সকালে সেখানে গিয়ে অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটা লম্বা খুব কালো পাথর পেলাম। সেটা মোচড়ানো। মোচড়ের মাঝখানটায় একটু সাদা চুনের মতো দাগ। সেটা অবশ্য চুন নয়। খুব শক্ত। পাথরটা বেশ ভারী। মনে হল, এইটেই উল্কা।

রাজশেখর বসু (পরশুরাম) উল্কা পাওয়ার কথা শুনে সেটা দেখতে চাইলেন। সেটা নিয়ে তাঁর কাছে গেলাম। তাঁর পাশে বসেছিলেন নরেন্দ্রদেব ও সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। কেউই ঠিক করে বলতে পারলেন না, সেটা একটা সাধারণ পাথর, না উল্কা।

রাজশেখর বাবুর নির্দেশে সেটা নিয়ে ভারতীয় জাদুঘরে গেলাম। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় একটা শো-কেসে মহেঞ্জোদড়ো থেকে আনা খেলামকুচি ভাঙা পুতুল ইত্যাদি সাজাচ্ছিলেন। তাঁর হাতে সেটি দিলাম। তাঁর সঙ্গে আর যাঁরা ছিলেন তাঁরা বললেন, সেটি উল্কা। উল্কাটি একটা শো-কেসে রেখে দেবার ব্যবস্থা হল।

এই উল্কা কি? উল্কা একরকম খুব শক্ত পিণ্ডবিশেষ। লোহা, পাথর ইত্যাদি দিয়ে তৈরী। বিজ্ঞানীরা বলেন, কোটি কোটি বছর আগে কোন ধূমকেতু ভেঙে অসংখ্য ছোট বড় উল্কাপিণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে। এগুলি নানা আকারের।

কোন কোন রাত্রে দেখা যায়, একটা জ্বলন্ত আলো তীব্র গতিতে আকাশ থেকে মাটিতে এসে পড়ল। সাধারণ লোকে একে বলে 'তারা খসা'। কিন্তু তারা কখনও খসতে পারে না। কারণ, তারা পৃথিবীর চেয়ে অনেক অনেক বড়। আমাদের সব চেয়ে কাছের তারা 'সূর্য'। তা আমাদের পৃথিবীর চেয়ে প্রায় তের লক্ষ গুণ বড়। আকাশের অন্যান্য তারা এই সূর্যের চেয়ে ঢের বড়। কোন কোনটি কোটি গুণ বড়।

ধূমকেতু ভেঙে উল্কার সৃষ্টি হয়েছে কিনা সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা একমত নন। কেউ কেউ বলেন, আমাদের সৌরজগৎ সৃষ্টি হবার অনেক অনেক আগে থেকেই মহাকাশে এই সব উল্কাপিণ্ড ছিল। কেউ কেউ বলেন, মহাকাশে ধূলো ও গ্যাস জমে উল্কাপিণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে।

উল্কাপিণ্ড নিজের কক্ষে ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবীর কাছে এসে পড়লে পৃথিবীর আকর্ষণে কক্ষচ্যুত হয়ে পৃথিবীর উপর পড়ে। প্রচণ্ড বেগে পড়বার সময় বাতাসের সংঘর্ষে জ্বলে ওঠে। যেগুলো ছোট সে গুলো পুড়ে ছাই হয়ে যায়। যেগুলো বড় সে গুলো জ্বলন্ত অবস্থায় মাটিতে এসে পড়ে। দেখা গেছে, সাধারণতঃ ২১শে এপ্রিল, ৯ই থেকে ১৪ই আগস্ট এবং ২৭শে ও ২৯শে নভেম্বর ঝাঁকে ঝাঁকে উল্কাপাত হয়।

পৃথিবীর নানা স্থানে নানা সময়ে অসংখ্য উল্কাপাত হয়েছে। বহুস্থানে বড় বড় উল্কাখণ্ড পাওয়া গেছে। দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকায় গ্রুটফনটীন নামক স্থানে যে উল্কাপিণ্ডটি পাওয়া গেছে তার ওজন প্রায় ৬০ মেট্রিক টন। গ্রীনল্যাণ্ডের কেপ ইয়র্কে যে উল্কাপিণ্ড পাওয়া গেছে তার ওজন প্রায় ৩৬½ টন। এটি নিউ-ইয়র্কে রাখা হয়েছে।

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে ২০০০ থেকে ৩০০০ উল্কাপিণ্ড ঝাঁকে ঝাঁকে পড়ে। বিজ্ঞানীরা তা থেকেই জানান, পৃথিবীর বাইরের মহাকাশ থেকেই উল্কাপিণ্ডরা পৃথিবীতে এসে পড়ে।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে লিসবনের কাছে অ্যাটল্যান্টিক মহাসমুদ্রে ঝাঁকে ঝাঁকে অসংখ্য উল্কা পড়ে। বহুদূর থেকে উল্কাপাতের সেই অপরূপ দৃশ্য দেখে লোকে মুগ্ধ হয়ে যায়।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুন সাইবীরিয়ার এক জনবিরল অঞ্চলে এক বিরাট উল্কাপাত হয়। এর ফলে ৫ থেকে ১০ মাইলের মধ্যে সব গাছ ধ্বংস হয়ে যায়। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে উল্কাপাতের সেই স্থান পরিদর্শনের সময় কোন বিশেষ উল্কাপিণ্ড পাওয়া যায় নি। তবে ২০০টি গর্ত দেখা গেছে।

কোন কোন বিজ্ঞানী বলেন, সাইবীরিয়ার উল্কাপিণ্ডটি কোন ছোট ধূমকেতুর মুণ্ড। অবশ্য ধূমকেতুর কোন চিহ্ন দেখা যায় নি।

———

কাইয়্যাক ও উমিয়্যাক

মিতালী বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রীনল্যাণ্ড এবং উত্তর মেরুর সন্নিহিত কোন কোন দ্বীপে এস্কিমো নামক জাতির লোকেদের বাস। তারা শীল বা সিন্ধুঘোটকের চামড়া ও তিমিমাছের হাড় দিয়ে এক ধরনের নৌকা তৈয়ারি করে। এই নৌকার নাম কাইয়্যাক (Kayak)। এই নৌকায় সাধারণতঃ মাত্র একজন লোকের বসার জায়গা থাকে। কাইয়্যাকে করে শীল মাছ, সিন্ধুঘোটক প্রভৃতি শিকার করা হয়। এতে কোন ভারী জিনিসপত্র বহন করা চলে না।

উমিয়্যাক (Umiak) এস্কিমোদের আর এক রকম নৌকা। মেয়েরা উমিয়্যাক চালায়। উমিয়্যাক কাইয়্যাকের মতো জোরে চলে না, আর তত হালকা নয়। উমিয়্যাক কাইয়্যাকের চেয়ে আকারে বড়ো।

———

নারদমুনি নাজেহাল

অনিল মিত্র

বহুদিন পর হঠাৎ নারদকে দেখে, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা তখুনি তাঁর সব কাজ ফেলে রেখে, মহাখুশি হয়ে বলে ওঠেন —"এই যে, এস এস, তা এতদিন পর বিবাদ-ভাজন, আবার নতুন কি সংবাদ আনলে ? তুমি হেন সজ্জন ব্যক্তি, যদি এদ্দিন একেবারে গা ঢাকা দিয়ে থাক, তবে, আমাদের এই স্বর্গভূমি যে একেবারে অন্ধকার হয়ে থাকবে ; অন্যের ঘরের যত সব মুখরোচক খবর, তুমি ছাড়া আর কেই-বা দেবে বল ? সত্যিই, যাই বল-না কেন, কাঁচকলা আর আতপচাল খেয়ে খেয়ে, মাথাটা তোমার একেবারেই গেছে দেখছি। পরস্পর বিবাদ বাধাতেও যেমন পার, আবার, কারো মধ্যস্থ সেজে, নিজের ট্যাকটিও বেশ গুছিয়ে নিতে পার, কি বল ? সাবাশ ভাই সাবাশ, বাহাদুর বটে ; তা, হে কূট-মন্ত্রণা-নবীশ, এদ্দিন পর এবার, হঠাৎ আবার কি-সংবাদ বহন করে আনলে ?"

এমন রসিকতাপূর্ণ কথা শুনে, নারদমুনিত' একেবারে গদ-গদ হয়ে, দেহটাকে বারকয়েক একটু দুলিয়ে নিয়ে, অতি বিনয়ের সঙ্গে বললেন —

"যাই বলেন-না কেন দাদু, বহুদিন পর, আমার একটা মনের ইচ্ছে পূর্ণ হয়েছে।" নারদের মুখে এই কথা শুনেই ব্রহ্মা একটু যেন অবাক হয়েই বলে ওঠেন — "বাঃ বেশ-বেশ, তা, এমন-কি মনের ইচ্ছাটা ছিল তোমার শুনি ?"

একটু কেমন বিষণ্ণমনেই নারদ "বলেন—আসলে, এমন একটা কঠোর তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করতে চাইছিলাম যার দ্বারা, এই স্বর্গ-মর্ত-পাতালে, ইচ্ছামত একটা মায়াজাল-বিস্তার করা যায় ; উঃ এর জন্যে কি আমি কম ঘোরা ঘুরেছি ! শেষ পর্যন্ত গিয়ে সেই সুউচ্চ শিখরের মাথায় ধ্যানে বসলাম। তা, আপনার আশীর্বাদে এতদিনে সেই তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেছি।"

এতক্ষণ বেশ মনোযোগ দিয়েই নারদের কথাগুলো শুনছিলেন সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা। নারদ চুপ করতেই, হঠাৎ ব্রহ্মা ক্ষেপে উঠে চিৎকার করে বলে উঠলেন — "পাগলের মতো কী-সব যা-তা বলছ, আমার আশীর্বাদে তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেছ ? নাঃ, ঐ অসহ্য ঠাণ্ডা জায়গার চূড়ায়, এতদিন কাটিয়ে দেখছি, বুদ্ধি-শুদ্ধি তোমার একেবারেই লোপ পেয়েছে। এতক্ষণ ধরে যা মনে আসছে, তাই বকে চলেছ ! আরে বুঝলাম, আমি নয় তোমাদের রক্ষাকর্তা ; কিন্তু, তোমার মুখে আবার স্বয়ং বিষ্ণুদেব যদি এই সব কথা

শোনেন, তা হলে-ত' দেখছি, মহা বিপদে পড়ে যাবে হে!

নারদমুনি এবার তাঁকে একটু ঠাণ্ডা করার জন্যেই বলে ওঠেন—"আরে ছ্যা ছ্যা, এ-আপনি কি বলছেন দাদু; আমি-কি এতই কাঁচা। স্বয়ং আপনার আশীর্বাদ থাকলে, আমি স্বর্গ মর্ত-পাতাল, সর্বস্থানেই মায়াজাল-বিস্তার করতে পারি। এবার আমায় আশীর্বাদ জানিয়ে বিদায় দিন, আমি আসি।"

এই বলে, নারদ ব্রহ্মার পদধূলি নিয়ে সেখান থেকে কৈলাসের পথে এগিয়ে গেলেন।

ভোলানাথ শিব-ত' নারদের মুখে তপস্যায় মায়াজাল-বিস্তারে সিদ্ধিলাভ হয়েছে শুনে, একেবারে তাজ্জব! তাঁর কোমরে জড়ানো বাঘছালখানা একটু কষে এঁটে নিয়ে, জড়ানো-স্বরে বলে উঠলেন—"সে-কী, তপোজ্জ্বী বিবাদবাহন, তুমিও কি আজকাল আমারই মতো গাঁজা-ভাঙ খেতে শুরু করছ নাকি? নাঃ ঢেঁকি বাহন হয়ে, তোমার বুদ্ধি-শুদ্ধিগুলো একেবারে ঢেঁকির মতোই হয়ে গেছে! যত সব, গাঁজা-গুলবাজি কথা বলতে শুরু করেছ দেখছি। যাক, আমার কাছে যা বলেছ, বলেছ; আমি না হয়, ভোলা-ভালা একজন। এতে এমন কিছু মনেও করব না। তবে, দেখ আবার, এ সব কথা যেন ঐ কুটচক্রী বিষ্ণুদেবকে বলে বোস না, তিনি শুনলে ত তোমায় একেবারে তার চক্রবাহন করে ছাড়বেন, বুঝলে হে? জান ত' সে কথা, আমার মতো এমন ভোলা-ভালাকেও তাঁর সেই মনোমোহিনী রূপ দেখিয়ে, কী-নাজেহালটাই না করেছিলেন! তোমার পরেও, যদি একবার তাঁর সেই মায়াজাল ফেঁদে বসেন, তাহলে আর নিস্তার নেই। কখন-যে তাঁর, কার উপর কি খেয়াল হয়, তা বোঝাই এক সমস্যা।"

কথাকটি বলেই, শিব এবার একেবারে বুঁদ হয়ে বসলেন; কিছুক্ষণের মধ্যেই গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে গেলেন! নারদমুনি এবার বুঝলেন যে, আর এখানে শুধু-শুধু দাঁড়িয়ে থেকে, সময় নষ্ট করে লাভ নেই। এ ধ্যান, ভাঙতে ভোলানাথের হয়ত কত যুগই কেটে যাবে। তিনি তখন তাঁর বাদ্যযন্ত্র একতারাটি হাতে নিয়ে, ঢেঁকি-বাহন হয়ে বৈকুণ্ঠের দিকে রওনা দিলেন।

এতদিন পর, হঠাৎ নারদকে দেখেই, বিষ্ণুদেব একেবারে আনন্দে আত্মহারা! নারদকে দুইহাতে জড়িয়ে ধরে, তাঁর কুশলাদি জিগ্যেস করে, নানান ভাবে আপ্যায়ন শুরু করে দিলেন। স্বয়ং বিষ্ণুদেবের এতটা আদর-আপ্যায়ন, নারদমুনি আগে কল্পনাও করতে পারে নি; তিনি একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়ে ভাবলেন, এই ত' সুযোগ এবার, এই সুযোগে সব কথাই খুলে বলে ফেলা যাক।

নারদের মুখে বিস্তারিত শুনেই—বিষ্ণুদেব ত' একেবারে প্রাণখোলা হাসি হেসে, মুনিবরের পিঠ চাপড়ে বলে ওঠেন "সাবাস মুনিবর, সাবাস! ধন্য তোমার কঠোর তপস্যা; এই তো চাই। তোমার মতো এমন একজন ভক্ত পেয়ে আজ আমি খুব খুশি! তোমার এই সিদ্ধিলাভ সার্থক হোক! এবার চল আমার সঙ্গে, আমরা একটু এক জায়গা থেকে বেড়িয়ে আসি গিয়ে।"

অলক্ষ্যে এর মধ্যে বিষ্ণুদেব তাঁর মায়াজাল বিস্তার করেছেন; এই মায়াজালে বিরাট এক প্রাসাদ গড়ে তুলে, তাতে স্বয়ম্বর-সভার আয়োজন করলেন। নারদকে নিয়ে বিষ্ণুদেব সেই স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হতেই নারদমুনি ঐ সভা দেখে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। মনে মনে এই বলে প্রার্থনা করতে লাগলেন —"হে প্রভু, হে দয়াল ঠাকুর, আমাকে তুমি যখন এই স্বয়ম্বর-সভায় আনলেই, তখন আমাকে এর উপযুক্ত একজন করে গড়ে তোল। ঐ রাজকন্যার আমিও একজন পাণিপ্রার্থী।" ভক্তের ডাক শুনে বিষ্ণুদেব তখন তথাস্তু বলতেই দেখা গেল, নারদ এক অসাধারণ রূপে আর পোশাকে সজ্জিত হয়ে উঠেছে। মুখটি কিন্তু তাঁর হয়ে উঠেছে, একটি বানরমুখো।

এবার ঐ রূপবতী রাজকন্যা, স্বয়ম্বর-সভা প্রদক্ষিণ করা কালে, নারদকে একেবারে উপেক্ষাই করে চলে গেলেন। মোহমুগ্ধ নারদ ভাবলেন রাজকন্যা হয়তো তাঁকে দেখতেই পান নি, এই ভেবে, তখুনি তিনি সোজা হয়ে সভামাঝে দাঁড়িয়ে উঠে, মুখখানাকে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাতে থাকলেন। এদিকে নারদের ঐ মুখাকৃতি দেখে, পার্শ্ববর্তী শিবানুচরদ্বয়—নন্দী আর ভৃঙ্গী মুখ বিকৃত করে, নানান

ব্যঙ্গোক্তি করতে লাগলো। তাদের অমন করতে দেখেই নারদমুনি ক্রোধোন্মত্ত হয়ে তাদের অভিসম্পাত দিতে লাগলেন।

শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, রাজকন্যা বৈকুণ্ঠাধিপতির গলাতেই মালা পরিয়ে দিয়েছেন এর পর সভা ভঙ্গ হয়ে যাবার পর যে যার স্বস্থানে প্রস্থান করল। নারদ কিন্তু, তখনও বিমূঢ়ের মতো, একা বসে কি যেন ভাবছেন! সারা দেহ যেন তাঁর বিষাদে অবসন্ন! মুখে তাঁর পরাজয়ের গ্লানিপূর্ণ বিষণ্ণতা! পিপাসায় কণ্ঠ জড়িয়ে তাঁর মুখে আর কোন কথা নেই; এইভাবে কিছুক্ষণ থাকার পর, নারদমুনি ধীরে-ধীরে পাশেই এক সরোবরের দিকে এগিয়ে গেলেন এই আশায় যে, যদি একটু জল পান ক'রে পিপাসা নিবারণ করা যায়; কিন্তু, এ-কী দেখছেন তিনি সরোবরের কাছে এসে দাঁড়াতেই! জলের উপর পরিস্কার তাঁর প্রতিচ্ছায়া, এ কী আকৃতি তাঁর মুখের!

হিতাহিতজ্ঞানহারা, ক্ষিপ্ত ক্রোধোন্মত্ত নারদ তখন, তাঁর সেই আরাধ্য দেবতাকেই গালমন্দ, অভিশাপ দিতে থাকলেন—"যে নারীর মোহে, তুমি আজ আমাকে এই সভা মাঝে হেয় প্রতিপন্ন করলে, সেই প্রিয়তমা নারীর বিচ্ছেদেই একদিন তোমাকে কেঁদে-কেঁদে ফিরতে হবে! আরও জানাই তোমাকে, যে বানর আকৃতিদ্বারা আমাকে বঞ্চনা করলে, তোমার স্ত্রী-রত্ন উদ্ধার করার জন্য সেই বানরের কাছেই তোমাকে সাহায্য চাইতে হবে।"

এই অভিশাপ দেবার পরমুহূর্তেই দেখা গেল, নারদের চোখের দৃষ্টি থেকে মায়াজাল অপসৃত হয়ে যেতেই, তিনি হায় হায় ক'রে বলছেন—"এ কী করলাম ঠাকুর, আপনাকেই অভিশাপ দিয়ে ফেললাম!" নারদের মুখে এই বিলাপোক্তি শুনে-বিষ্ণুদেব সহাস্যে তাঁকে বললেন "এত বিচলিত হচ্ছ কেন মুনিবর! তুমি ত সত্যিই একজন প্রিয় ভক্ত আমার। সবই ভবিতব্য। তুমি নিমিত্ত মাত্র! আমার যে রামলীলার সময় হয়ে এল। তারই সূচনা তুমি আজ আগে থেকেই ক'রে রাখলে। মায়াজালবিস্তারে সিদ্ধিলাভ করাটা কি এতই সোজা মুনিবর?"

জলছবি

হরু দত্ত

ক্লান্ত দুপুর
রোদের নূপুর
বাজছে বিশাল প্রাঙ্গণে।

একটি শালিক
বসছে খানিক
খুঁটছে খাবার আনমনে।

তালের পাতা
নাচায় মাথা
চড়ুই ঘাসের জাল বোনে।

বন পায়রা
ডেকেই সারা
বন্ধু কোথায় কোন্ বনে।

জলের পুকুর
খুঁজছে কুকুর
বাতাস আগুন গনগনে।

বাদল সাজে
মাদল বাজে
বিষম গুরুগর্জনে।

আকাশ কালো
নিভলো আলো
সবাই ঢোকে ঘর কোণে।

যযাতি

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

বরাকর নদীটা যেখানে বাংলা আর বিহারকে আলাদা করে দিয়েছে তারই কাছাকাছি একটি জঙ্গল। এর চারদিকেই শালগাছের ভিড়, কিন্তু নদীর কাছটা শরবনে ঢাকা থাকায় ওদিকটায় কেউ একটা যেতে চায় না। তার ওপর ওখানে নাকি নদীর পাড় ঘেঁষে আছে চোরা বালি। দূর থেকে বোঝা যায় না কিন্তু সে বালিতে পা দিলে মানুষ শুদ্ধু তার মধ্যে তলিয়ে যাওয়া কিছু বিচিত্র নয় এই জন্যই জায়গাটিকে সম্পূর্ণ লোকালয় বর্জিত বললে ভুল হবে না।

অবশ্য জঙ্গলে ঢুকবার একটা চোরা পথও আছে। ঘাস বন আর কাঁটাঝোপে ছাওয়া এই পথটির কথা বাইরে থেকে বোঝা মুশকিল, কিন্তু একবার সব বাধা অতিক্রম করে যদি ভিতরে ঢোকা যায় তা হলে দেখা যাবে ওরই মধ্যে হাত কুড়ি-পঁচিশ জায়গা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন,—যেন কেউ কোদাল দিয়ে চেঁছে পরিষ্কার করে নিয়েছে। আর, আশ্চর্য, সেই কোদাল কোপানো জায়গায় কারা যেন একটা তাঁবু বসিয়েছে।

এই দুর্গম জঙ্গলের মধ্যে তাঁবু? কারা বসাল? সরকারী বনবিভাগের লোকেরা? নাকি কোন ভূতাত্ত্বিকের দল?—কিন্তু কেন?

এক হতে পারে বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা করে গেছে কেউ ওখানে, কিংবা ওদের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্রেফ জরীপ করা। সারাদিন কাজের পর রাত্তির কাটাবার জন্য ঐ রকম একটা নিরাপদ জায়গাই তো চাই। কিন্তু এত জায়গা থাকতে ঐ দুর্গম জায়গাটাই বেছে নেবার কারণ কি?

সন্ধ্যা হলেই কিন্তু রহস্যের মীমাংসা হবে। ভূতাত্ত্বিকের দলও নয়, বনবিভাগের লোকও নয়—ওটি একটি ডাকাত দলের সাময়িক আড্ডা। সারাদিন ধরে এর ওর পকেট কেটে, একে ওকে ছিনতাই করে কিংবা সময় সময় আরও দুঃসাহসিক লুটপাট সেরে দলের সবাই সন্ধ্যার পর এসে এখানে জড় হয়। এখানেই সর্দার ডাকাতের তত্ত্বাবধানে সাগরেদদের মধ্যে লুণ্ঠিত দ্রব্যের ভাগ বাঁটোয়ারা হয়। সর্দারের ভাগটা একটু বেশিই হয় কিন্তু সেটা সর্দার হিসেবে তার অতিরিক্ত প্রাপ্য ভেবে কেউ আপত্তি করে না। দলের কেউ দলের ক্ষতি বা বিশ্বাসঘাতকতা করলে তারও বিচার-ব্যবস্থা হয় এখানেই।

আজও সন্ধ্যায় তাঁবুর সামনে দলের জনা কয়েক এসে জড় হয়েছে। দলের সর্দার নিমচাঁদ আগেই এসে তাঁবুর মধ্যে বসে আছে। আরও জনা তিনেক আসতে বাকি, তারা এলেই দৈনন্দিন ভাগ বাঁটোয়ারার কাজ শুরু হবে।

একটু পরে আরও দুজন এল। তাদের একজন তখনও খোঁড়াচ্ছে। এতে কেউই আশ্চর্য হ'ল না। সবাই জানে, এদের এ পেশাটা নিরবচ্ছিন্ন সুখের পেশা

নয়। সময় সময় ধরা পড়'লে প্রচণ্ড মারধোর খেতে হয়, মাঝে মাঝে শ্রীঘর বাসও করে আসতে হয়। আর ধরা পড়বার ভয়ে পালাতে গেলেও নানা দৈহিক দুর্গতি ঘটতে পারে। খানায় পড়ে পা মচকে যাওয়া বা ইটের ঘায়ে জখম হওয়া—এতো নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার।

কিন্তু একজন এখনও এসে পৌঁছল না। নিমচাঁদ বারে বারে ঘড়ি দেখছে। রাত আটটা বাজতে চলল। তার মানে কাজকর্ম সেরে উঠতে দশটা বেজে যাবে হয়তো। অত রাত্রে এই জঙ্গলে বসে থাকা খুব বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। চারদিকে "টিকটিকির" দল ঘুরে বেড়াচ্ছে, কখন কে এসে বিপত্তি বাধায় ঠিক নেই। অবশ্য তাদের ঠেকাবার মতো প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র ওদের সঙ্গে মজুত আছে, তবু -, পারতপক্ষে ও সব ঝামেলার মধ্যে না যাওয়াই ভালো।

যে লোকটি এখনও এসে পৌঁছয়নি তার নাম সুন্দরলাল। বছর খানেক হ'ল সে এ দলে ঢুকেছে আর-একজন সাগরেদের সুপারিশে। নিমচাঁদ গোপনে অনেক খোঁজ খবর নিয়ে জেনেছে যে লোকটা ছদ্মবেশী পুলিশের লোক নয়, "টিকটিকি"ও নয় সত্যিই এই পেশার আকর্ষণে দলে যোগ দিচ্ছে। কাজেই সেদিক্ দিয়ে কিছু বলার নেই। কিন্তু ও রোজই যখন তখন দেরী করে আসে, দলের শৃঙ্খলা মানতে চায় না। নিমচাঁদের কড়া নির্দেশ, উপার্জন হোক না হোক সন্ধ্যায় একবার এখানে প্রত্যককেই হাজিরা দিতে হবে। কিন্তু সুন্দরলাল সেটা গ্রাহ্য করতে চায় না। কোনদিন হয়তো এলই না, দু'-তিন দিন বাদে তিনদিনের রোজগার এনে ধুপ করে ফেলে দিল।

আজও বোধ হয় সে আসবে না। ঘড়ির কাঁটা দ্রুতবেগে ঘুরে চলেছে। আর বেশিক্ষণ এখানে থাকা চলবে না। তাকে বাদ দিয়েই কাজ সারা যাক তা হলে।

নিমচাঁদের বয়স হয়েছে। তা ষাট তো হবেই, হয়তো আরও কিছু বেশি হতে পারে। চুলে বেশ পাক ধরেছে। বয়স তুলনায় শরীর সুস্থ থাকলেও তাতে যে শীগ্‌গিরই ভাঙ্গন ধরবে এ তার বুঝতে বাকি নেই।

ভাগ বাঁটোয়ারা শুরু হ'ল। আজকের রোজগার কারও তেমন সুবিধের নয়। কালাচাঁদ পকেট কেটে একটা মনিব্যাগ এনেছে বটে কিন্তু তার মধ্যে রয়েছে মাত্র একখানা পাঁচ টাকার নোট আর সামান্য কয়েকটা সিকি আধুলি।

নিমচাঁদ চটে গিয়ে বলল, "যত সব অকম্মার ধাড়ি! এ ভাবে চললে ব্যবসা গুটিয়ে যে যার নিজের নিজের পথ দেখ গিয়ে।"

আর ঠিক সেই সময় এসে হাজির হল সুন্দরলাল। পকেট থেকে একটা মোটা সোনার হার সর্দারের দিকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, "সোনার ভরি এখন কত সর্দার? হিসেব কর তো এ হার ছড়ার দাম কত হতে পারে? খুব তো লম্বাই চওড়াই বাৎ ঝাড়ছ, নিজে কি রোজগার করেছ শুনি? পরের রোজগারের ওপর দিব্যি ফলাও করে ভাগ বসাতে লজ্জা করে না তোমার?"

নিমচাঁদের সঙ্গে যে কেউ এভাবে কথা বলতে পারে তা নিমচাঁদ কেন, দলের আর কেউ কল্পনাও করতে পারত না। নিমচাঁদ বাঘের মত হুঙ্কার দিয়ে বলল, "কি বললি! আবার বল্ তো! আস্পর্দ্ধা তো কম না তোর!"

"হ্যাঁ, ফের বলছি। নিজের তো ঐ মুরোদ। পরের ধনে পোদ্দারী করে আর কতদিন চালাবে সর্দার? শুধু বোলচাল দিয়ে এখন আর চিড়ে ভিজবে না। সে দিন গেছে।"

নিমচাঁদ আর থাকতে পারল না। পাশে রাখা ভোজালিখানা তুলে নিয়ে তেড়ে এল সুন্দরলালের দিকে। সুন্দরলাল কিছুমাত্র ভয় না পেয়ে চকিতে লাঠি গাছটা দিয়ে সজোরে আঘাত করল ভোজালির ওপর। ভোজালি নিমচাঁদের হাত থেকে তিন হাত দূরে গিয়ে ছিটকে পড়ল।

নিমচাঁদ এরপর কি করত বলা যায় না, কিন্তু তার সঙ্গীরা তাকে আগলে ধরল আড়াল করে। একজন সুন্দরলালের দিকে চেয়ে বলল, "তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে;—নাকি নেশাটেশা করে এসেছিস?"

সুন্দরলাল নিজের সুপুষ্ট দুই বাহু আর বিশাল বক্ষকপাটের দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল, "না, নেশা আমি করি না। তবে অন্যায়ও সহ্য করতে রাজী নই।"

নিমচাঁদ রাগে থর থর করে কাঁপছিল। কিন্তু সুন্দরলালের শক্তপোক্ত দেহের দিকে একবার তাকিয়েই সে বুঝে নিয়েছিল নিজের মান বাঁচাতে হলে এখন মনে মনে চুপ করে যাওয়াই ভালো।

ব্যাপারটা সেদিন ওখানেই চুকে গেল বটে কিন্তু নিমচাঁদের মনে স্বস্তি ছিল না। সে বুঝতে পারছে সত্যি তার বয়স বাড়ছে। আজ বাদে কাল দেহে জরার আবির্ভাব ঠেকানো যাবে না। তার মনে পড়ল বহুদিন আগে সে একবার দুই দাঁতাল হাতীর লড়াই দেখেছিল। গভীর জঙ্গলের মধ্যে একটা পাহাড়ের আড়ালে বসে বসে দেখা সেই দৃশ্য আজও সে ভুলতে পারে নি। পাহাড়ের অনেকটা নীচে দিয়ে চলেছিল একপাল বুনো হাতী। সেই দলের সর্দার ছিল একটা বুড়ো দাঁতাল হাতী। হয়তো দলের দলপতিত্ব কেড়ে নেবার জন্যই একটা জোয়ান দাঁতাল হাতী তাকে যুদ্ধে আহ্বান করে। সেই বন-কাঁপানো লড়াইএর কথা সে কোনদিন ভুলতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত জোয়ানের কাছে বুদ্ধের পরাজয় ঘটছিল। বুড়ো দলপতি যুদ্ধে হেরে প্রাণের ভয়ে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে পালাচ্ছে আর জোয়ান হাতীটা তাকে তাড়া করে চলেছে—সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। বুড়ো হাতীটা আর ফিরল না। অন্য হাতীগুলো এতক্ষণ চুপচাপ অপেক্ষা করে দাঁড়িয়েছিল যুদ্ধের ফলাফল কি হয় দেখবার জন্য। বিজয়ী জোয়ান হাতীটা ফিরে এল আর তাদের সবাই সসম্ভ্রমে তাকেই দলপতি বা যূথপতি হিসেবে মেনে নিল।

তার দশাও কি শেষ পর্যন্ত ঐ বুড়ো হাতীটার মতো হবে?

না না, নিমচাঁদ বেঁচে থাকতে তা হতে দেবে না। এর প্রতিকার সে করবেই। কিন্তু কেমন করে?

সুন্দরলালের গায়ে অসাধারণ শক্তি। বয়সেও সে তরুণ যুবা। তার ওপর যে-সব গুণ থাকলে নিমচাঁদের মতে তাদের এই পেশায় সাফল্যলাভ করা যায় তা তার আছে। আর সব চেয়ে বড় কথা, সে কারও তোয়াক্কা করে না—এমন কি সর্দার বলে নিমচাঁদকেও সে পাত্তা দিতে চায় না।

হঠাৎ মনে পড়ল, কিছুদিন আগে সে এক সাধুবাবার কথা শুনেছিল। হিমালয়ের ওপরে আলমোড়ার কাছে তাঁর আশ্রম। তিনি সেখানে কায়কল্প গোছের কি একটা চিকিৎসা করেন। চিকিৎসা না বলে শিক্ষা দেন বললেই বোধ হয় ঠিক বলা হয়। এই শিক্ষার বলে মানুষ নবযৌবন লাভ করে বৃদ্ধও ফের তরুণ হয়ে যায়। তবে চিকিৎসা বা শিক্ষা যাই বল—নাকি বেশ কঠিন। কিন্তু যত কঠিনই হোক, নিমচাঁদ তা আয়ত্ত করবেই। মনে পড়ল মহাভারতের সেই যযাতি রাজার কথা। বৃদ্ধ বয়সে শরীর জরাগ্রস্ত হয়ে পড়লে তিনি সেই জরা তার ছেলে পুরুকে দিয়ে তার যৌবন চেয়ে নিয়েছিলেন। একালে অবশ্য ওভাবে কেউ জরা নিয়ে নিজের যৌবন দিয়ে দিতে পারে না, কিন্তু চেষ্টা করলে ঐ জরাকে তাড়িয়ে দিয়ে পুনর্যৌবন পাওয়া অসম্ভব নয়—কায়কল্পে নাকি সেই ব্যবস্থা আছে, আছে এই সাধুবাবার শিক্ষাপদ্ধতিতেও। নিমচাঁদকে তাই আয়ত্ত করতে হবে।

কয়েকদিন চিন্তা করে নিমচাঁদ মন ঠিক করে ফেলল। এ ক'দিন সে সুন্দরলাল কেন, কাউকেই আর খাটায় নি। এর আগে দলের কেউ অকর্মণ্যতার পরিচয় দিলে সে বারুদের মতো জ্বলে উঠত, কিন্তু এ ক'দিন সে সে-সব দেখেও দেখল না।

তারপর একদিন নিমচাঁদ সকলকে ডেকে বলল, "আমার একটু দেশভ্রমণের ইচ্ছে হয়েছে, তাই কিছুদিনের জন্য একটু ঘুরতে বেরুচ্ছি। তোদের আর কাউকে ব্যবসা বন্ধ রেখে আমার সঙ্গে যেতে বলব না, একা একাই বেরুব। তোরা তোদের কাজ আগের মতই করে যাস। দেশভ্রমণ সেরে আবার আমি এসে তোদের সঙ্গে যোগ দেব।"

"সে কি সর্দার। তুমি আমাদের ছেড়ে যাবে?"—অবাক্ হয়ে বলল তার অনুগত, দলের একজন ছোকরা সাগরেদ।

"পাগল! তোদের কি একেবারে ছেড়ে যেতে পারি? ঐ তো বললাম, কিছুদিনের জন্য একটু দেশটা ঘুরে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে। একা একা না ঘুরলে কি দেশ দেখা যায়?"

শুনে সবাই যেন একটু মুষড়ে পড়ল, কেবল সুন্দরলালের মুখে দেখা দিল একটা বাঁকা হাসি।

সে হাসি যে শ্লেষের তা বুঝতে কষ্ট হয় না। নিমচাঁদ ঠোঁটে ঠোঁট চেপে নিজেকে সামলে নিল।

আলমোড়ার আশ্রমে সাধুবাবা নিবিড়ানন্দজীর কাছে নিমচাঁদের পুনর্যৌবন লাভের চিকিৎসা শুরু হয়েছে। ঠিক চিকিৎসা নয় শিক্ষাই বলা যেতে পারে। তার মধ্যে আছে বেশ কয়েক রকম কঠিন কঠিন যৌগিক ব্যায়াম এবং হঠযোগ। তাছাড়া খাওয়াদাওয়ার কঠিন কতকগুলি নিয়মও মেনে চলতে হচ্ছে। সাধুবাবা আরও বলেছেন, মনে কোন রকম মন্দভাব, খারাপ চিন্তা রাখা চলবে না, মনকে সর্বদা রাখতে হবে প্রফুল্ল—তাজা ফুলের মতো, তা সকলকে আনন্দ দেবে। আর, আশ্চর্য ! বছর খানেক যেতে না যেতেই নিমচাঁদ দিব্যি, বুঝতে পারল যে তার বয়স অনেক কমে গেছে। গায়ের চামড়া শিথিল হয়ে এসেছিল, সেগুলো আবার টান টান হয়ে উঠেছে, কালো চুলে সাদার ছোপ এখন আর তেমন চোখে পড়ে না। পেশীগুলিও হয়েছে যেমন পুষ্ট তেমনি সবল।

আরও এক বছর পার হ'ল। নিমচাঁদকে একজন তরুণ যুবক বলেই ভুল হয়। যযাতি যেমন জরাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আবার নূতন যৌবনলাভ করেছিলেন, সেও কি তাহলে তাই পেয়ে গেল? বেঁচে থাকুন সাধুবাবা নিবিড়ানন্দজী!

পরের বছর নিমচাঁদকে দেখে কে বলবে, তার বয়স ষাট বছর কবে পেরিয়ে গেছে। সে যেন আবার পঁচিশ বছর বয়সের পূর্ণ যুবকে পরিণত হয়েছে। গায়ে যেমনি শক্তি, শরীরের গড়ন তেমনি সুঠাম। এ নিমচাঁদ আর সে নিমচাঁদ নেই,—যদিও মুখের চেহারা ঠিকই আছে, দেখলে নিমচাঁদ বলে চিনতে ভুল হয় না।

সাধুবাবার পায়ে প্রচুর প্রণামী দিয়ে, আশ্রমের অন্যান্য বাসিন্দাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিমচাঁদ দেশের দিকে রওনা হ'ল। কিন্তু দেশে গিয়ে কি করবে এখন—চট্ করে মনে পড়ছে না তো! হ্যাঁ, হ্যাঁ, সুন্দরলালকে একচোট দেখে নিতে হবে।

বরাকরের অনতিদূরে সেই জঙ্গলটা, এখনও তেমনি দুর্ভেদ্য রয়েছে, আর তারই একটা নির্জন জায়গায় নিমচাঁদের আখড়াটাও টিকে আছে। তবে এখন সেখানে তাঁবুর বদলে একটা চালাঘর উঠেছে। আজ পর্যন্ত কোন তথাকথিত ''টিকটিকি''-র নজর পড়েনি ওখানে। আজও সন্ধ্যার পর দলের সকলে ওখানে গিয়ে জড় হয়, দরকার হলে রাতটাও কাটিয়ে দেয় কেউ কেউ। সুন্দরলালের মাতব্বরী এখন আরও বেড়েছে। সবাই তাকে ডাকে ছোট সর্দার বলে।

অতি পরিচিত আখড়া, তবু সেটা খুঁজে বার করতে নিমচাঁদের অনেকটা সময় লাগল। তবে শেষ পর্যন্ত সে খুঁজে বার করল জায়গাটা, তারপর হঠাৎ ধূমকেতুর মতো এসে হাজির হ'ল।

দলের সবাই প্রথমটা এই অচেনা আগন্তুককে দেখে চমকে উঠেছিল। একজন তো তার পাইপ গানটা উঁচিয়েও ধরেছিল তার দিকে। নিমচাঁদ হো-হো করে হেসে উঠে হাত বাড়িয়ে তাকে থামিয়ে দিল। বলল, "চিনতে পারছিস না আমাকে? ভালো করে দেখ। আমি তোদের সর্দার নিমচাঁদ,—কায়কল্প গোছের একটা চিকিৎসার হদিস পেয়ে এ ক'বছর সেখানে থেকে বয়সটা কমিয়ে ফেলেছি। কেমন, জোয়ান জোয়ান মনে হচ্ছে না আমাকে?"

সত্যিই তো, গলার স্বর, কথা বলার ভঙ্গী, মুখের সেই আদল—সবই তো মিলে যাচ্ছে! শুধু বয়সটা যেন অনেক কম মনে হচ্ছে, আর শরীরটাও যেন জোয়ান জোয়ান পালোয়ানের মতো হয়ে গেছে। সকলে অবাক। সবচেয়ে অবাক সুন্দরলাল। এও কি তা হলে সম্ভব?

নিমচাঁদ আবার সর্দারের পদে প্রতিষ্ঠিত হ'ল। বহুদিনের পুরোনো পেশা, তা কি সহজে ছাড়া যায়? এখন থেকে তার নাম হ'ল বড় সর্দার, সুন্দরলাল ছোট সর্দার।

দিন এগিয়ে চলল। নিমচাঁদ এখন চেহারায় একেবারে তরুণ,—কর্মশক্তিও তার সেই অনুপাতে বাড়বার কথা। কিন্তু এ কি! মন তো তার মোটেই প্রথম বয়সের মতো তাজা বোধ হচ্ছে না! সব ব্যাপারে কেমন যেন একটা আলসেমির ভাব, আগের সেই উদ্যম তো কই, ফিরে আসছে না? নিজেই সে বুঝতে পারছে না, কেন এমনটা হচ্ছে।

শুধু তাই নয়, কিছু দিন পরেই তার কয়েকটা নতুন উপসর্গ দেখা দিতে লাগল, কোন কিছুই সে যেন

আর মনে রাখতে পারে না, সামান্য কথাও কেমন যেন গোলমাল হয়ে যায়। আজকাল কানেও যেন কেমন একটু কম শুনছে, দৃষ্টিশক্তিও আগের মতো প্রখর নেই। টাকাপয়সা রোজগারের দিকেও যেন আগের মতো আগ্রহ নেই। আগের পেশায় ফিরে এসেছে বটে, কিন্তু এযেন নেহাৎ-ই একটা দায় সারা কাজ। নিমচাঁদ নিজেই পরিবর্তনটা বুঝতে পারে। কিন্তু এরকম হলে চলবে কেন? বৃথাই তবে সে আলমোড়ায় গিয়ে এ ক'বছর অকল্পনীয় পরিশ্রম করে এল।

ডাকাতির ব্যবসায় নামলেও নিমচাঁদ একেবারে ছোটলোকের ঘরে জন্মায় নি, মোটামুটি শিক্ষিত পরিবারেই তার জন্ম। ইস্কুলে লেখাপড়ায় সে নেহাৎ খারাপ ছিল না, এমন কি বছর দুয়েক কলেজেও পড়েছিল। তার পর তার জুটল কয়েকজন কুসঙ্গী, তারাই তাকে এই গোল্লায় যাবার পথে টেনে এনেছিল। কুসংসর্গে মিশে শেষ পর্যন্ত সে যে পেশা বেছে নিল তা ভদ্র সমাজে কল্পনা করা যায় না, তবে ভদ্র বংশের ছেলে বলে বাইরের লোকের কাছে সে নিজেকে ওভাবে ধরা দিত না, তখন তার চালচলন দেখে কেউ তার স্বরূপ বুঝতে পারত না। কিন্তু এবার সে সত্যি ভয় পেয়ে গেল।

হঠাৎ তার এক বাল্য সাথীর কথা মনে পড়ল। সে নাকি এখন মস্ত বড় ডাক্তার হয়েছে—বিশেষ করে মনের রোগের চিকিৎসায় তার খুব নাম। নিমচাঁদ ভাবল একবার তার কাছে যাবে। কিন্তু এতদিন পরে সে কি তাকে চিনতে পারবে? আর চিনলেও যদি নিমচাঁদের বর্তমান হালচালের কথা তার জানা থাকে, তা হলে সে কি আর দেখা করতে চাইবে? তখন নিমচাঁদও তাকে গোবরা বলেই ডাকত। এখন তার নাম ডক্টর গোবর্দ্ধন রায়। অবশ্য নামের পরে অনেকগুলি ইংরেজি অক্ষরও বসানো আছে, যার সঠিক অর্থ নিমচাঁদ জানে না। তবে শুনেছে সেগুলি নাকি সব ভারীভারী বিলিতী ডিগ্রী।

যাই হোক, একদিন সকালে উঠে নিমচাঁদ সাহসে ভর করে ডাক্তার গোবর্দ্ধন রায়ের বাড়ি এসে হাজির হ'ল। ভালো নামটা তার মনেই এল না, গেটের সামনে দাঁড়িয়ে "গোবরা! গোবরা!" বলে চীৎকার শুরু করে দিল।

দরোয়ান গোছের একটা লোক এসে বলল, "চিল্লাও মাৎ। কিসকো মাংতা?"

নিমচাঁদ ঘাবড়ে গিয়ে বলল, "গো—গোবরাকো—হামারা দোস্ত।

চিল্লাও মাৎ কিসকো মাংতা

"গোবরা? ও কোন হ্যায়? যাও যাও দিক মৎ কর।"

ঠিক এমনি সময়ে ওপরের বারান্দা থেকে কে একজন মাথা বার করে বললেন, "এই রামসিং? উনকো ব্যাঠনে বোলো। হম্ তুরন্ত আতা হুঁ।"

ডক্টর গোবর্দ্ধন রায় তাঁর 'গোবরা'' নামটার কথা ভুলেই গিয়েছিলেন। এতদিন পরে হঠাৎ সেই নাম শুনে মনে হল লোকটি নিশ্চয়ই সেকালের তাঁর বন্ধুস্থানীয় কেউ হবে। কৌতূহলী হয়ে একটু পরেই তিনি নেমে এলেন।

বলা বাহুল্য প্রথমটা কেউ কাউকে চিনতে পারল না, তবু নিমচাঁদ যখন গ্রামের স্কুলে দু-একজন মাস্টারমশাই আর এর ওর নাম করল তখন অবাক হয়ে ডঃ গোবর্দ্ধন রায় বললেন, "আরে নিমে! তুই! বোধ হয় আজ

পঞ্চাশ বছর পরে দেখছি। কিন্তু মুখের আদলটা ঠিক আছে। কিন্তু এখনও এমন ছোকরা আছিস কি করে, সত্যি নিমে তো? না তার ছেলে?"

আরও দু-চারটে টুকিটাকি কথার পর নিমচাঁদ তার আসার উদ্দেশ্য বর্ণনা করল। আলমোড়ার সাধুবাবার কাছ থেকে পুনর্যৌবন লাভের কাহিনীও বলল শুধু বলল না তার পেশার কথা, যা ডাক্তার জানেন না বলেই সে বুঝে নিয়েছিল।

ডাক্তার বললেন, "হুঁ, তাই বল, এরকম শুনেছি বটে কিন্তু আজ চোখে দেখলাম. চেহারাটা তো দিব্যি বাগিয়েছিস. কিন্তু আসল জায়গা, মাথাটা?—সেটাই তা হলে পরীক্ষা করে দেখব। চল্ আমার চেম্বারে।"

নানারকম যন্ত্রপাতিতে ঠাসা সেই ঘর তো ডাক্তারের চেম্বার নয়, যেন একটা ল্যাবরেটরী। ডাঃ গোবর্দ্ধন নিমচাঁদকে একটা চেয়ারে বসিয়ে তার মাথাটা নানাভাবে পরীক্ষা করলেন। তারপর ঘরের দরজা বন্ধ করে আলো নিভিয়ে দিয়ে একটা যন্ত্র থেকে একরকম তীব্র আলো এনে ফেললেন নিমচাঁদের মাথার খুলির ওপর। পাশেই ছিল একটা অদ্ভুত ধরনের পর্দা। মনে হল সেই পর্দার ওপর নিমচাঁদের মাথার ভিতরকার সমস্ত কলকব্জার ছবি উঠে গেছে। গোবর্দ্ধন আলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আতিপাতি করে পরীক্ষা করে চললেন সেই ছবি।

প্রায় আধঘণ্টা পরে সুইচ অফ্ করে দরজা খুলে দিলেন।

অনেকক্ষণ কি চিন্তা করলেন ডাক্তার, তারপর বললেন, "হুঁ, যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই, বয়স কমলে কি হবে, মন তো বদলানো যায় নি! মন বলতে আমরা মগজটাকে বুঝি, কারণ আমাদের যা চিন্তা-ভাবনা, আচার-আচরণ, সমস্ত অনুভূতি সবেরই আস্তানা হচ্ছে এই মগজ, সেই মগজ তোর বদলানো সম্ভব হয় নি। সেটা যেমন বুড়োর মগজ তেমনি বুড়োর মগজই রয়ে গেছে। এখন বুঝতে পারছিস বোধ হয় কেন তোর স্মরণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি কমে আসছে। শরীরের অন্যান্য অংশের মতো মগজও তো কতগুলি কোষ দিয়ে তৈরি। আমরা বলি মগজ-কোষ বা ব্রেইন সেল। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এই মগজ-কোষ কুঁকড়ে ছোট হয়ে আসে। বয়স যত বাড়ে মগজও তত ছোট হতে থাকে। বেশী দিন বেঁচে থাকলে মগজের ওজন দেড়শ থেকে দুশ' গ্রাম পর্যন্ত কমে যেতে পারে। হবেই তো, মগজের কোষ কুঁচকে যাওয়া মানেই তো মগজ ছোট হয়ে যাওয়া। আরও একটা কাণ্ড ঘটে। আমাদের শরীরের সমস্ত কোষে রক্ত সঞ্চালনের জন্য রয়েছে অসংখ্য ধমনী বা আর্টারি। তারাই কোষগুলিকে সতেজ রাখে। বয়স সঙ্গে সঙ্গে এই ধমনীগুলিও শক্ত হতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে আরও পুরু হয়ে যায়। মগজেও তো রক্ত-সঞ্চালন করার ভার এদেরই উপর! কিন্তু ঐ রকম শক্ত হয়ে যাবার ফলে তা দিয়ে আর আগের মতো রক্ত সঞ্চালন সম্ভব হয় না। ফলে কোষগুলো বাড়বে কি করে? যাই হোক, মগজের সঙ্গেই রয়েছে অসংখ্য স্নায়ু, যা নাকি আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলির সঙ্গে যুক্ত আর ওরই ফলে আমরা দেখতে পাই, শুনতে পাই, গন্ধ টের পাই, জিভে স্বাদ পাই, স্পর্শ টের পাই। এখন, মগজ যদি কুঁচকে ছোট হয়ে যায় তাহলে ওদের ভিতরের ফাঁক গুলিও সরু হয়ে যাবে আর ওর সঙ্গে যুক্ত স্নায়ুগুলোও তখন ঠিক মতো তাদের কাজ করতে পারবে না। স্নায়ুগুলোই তো টেলিগ্রামের তারের মতো মগজের সঙ্গে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যোগাযোগের কাজ করে। আজকাল মগজের এই ব্যাপার স্যাপার নিয়ে বিজ্ঞানীরা প্রচুর গবেষণা করে চলেছেন। বুড়ো হলে মগজের কাজ কেন বিফল হতে থাকে তার কারণ খুঁজে বার করছেন। কিন্তু এই রকমই হয়। এখন স্নায়ুগুলো দুর্বল হয়ে পড়লে কি হবে? তখন ধীরে ধীরে দৃষ্টি শক্তি কমতে শুরু করবে, কানও সব কথা ঠিক মতো ধরতে পারবে না, স্মৃতি শক্তিও আস্তে আস্তে কমে আসবে কথা মনে থাকবে না, লোক চিনতে ভুল হবে—এই রকম আরও কত কি! একেই তো আমরা বলি জরা। আর বয়সের সঙ্গে এই জরা আসবেই—কারো দু'দিন আগে, কারো দু'দিন পরে।"

নিমচাঁদ বাধা দিয়ে বলল, "তা হলে আমি যে পুনর্যৌবন পাবার জন্য এত করলাম দেহের দিক দিয়ে পেলামও, তার কি কোন মূল্য নেই?"

ডাক্তার হেসে বললেন, "তুই খোদার ওপর খোদকারী করতে গিয়েছিলি। ফলে শরীরটা হয়তো

তরুণের মতো হয়েছে ঠিকই, কিন্তু মগজের ওপর কারিকুরি করার সাধ্য নেই কারো—অন্ততঃ আজ পর্যন্ত যতদূর জানি। তাই মনের ওপর তার প্রতিক্রিয়া থাকবেই। আর বুড়ো হলে এই জরার হাত থেকে রেহাই নেই। তাই জোয়ান চেহারা পেয়েও বার্ধক্যের অন্যান্য যা যা লক্ষণ সেগুলোকে বইতে হচ্ছে তোকে। আর কিছুদিন গেলে দেখবি তোর দেহের আর মনের মধ্যে কোন সামঞ্জস্যই আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

"এর তা হলে কোন চিকিৎসা নেই ?"- হতাশভাবে প্রশ্ন করল নিমচাঁদ।

"না। একেই আমরা বলি নিয়তি। জোর করে কিছু কিছু তার পালটাতে পারলেও সব কিছু পালটে দেওয়া যায় না। তা হলে সৃষ্টির নিয়মই যে লণ্ড ভণ্ড হয়ে যাবে! বাল্য যৌবন —বার্ধক্য, তারপর একদিন তার লয়; এই হচ্ছে সৃষ্টির নিয়ম

নিমচাঁদ উঠে এল। পথ চলতে চলতে তার কেবলই মনে হতে লাগল একটা বছর সে বৃথাই এত কষ্ট করেছে। কলি যুগের যযাতি তার দেহ থেকেই জরাকে বিদায় দিয়েছে, কিন্তু মন থেকে তাকে সরাতে পারে নি।

অভ্যাস মতো গুটি গুটি নিমচাঁদ সন্ধ্যার সময় আবার সেই জঙ্গলের আড্ডায় এসে পৌঁছল। অন্ধকারে দলের লোকেরা তখন এক এক করে জড় হচ্ছে। সুন্দরলাল আজকাল তাদের ফুর্তির জন্য প্রায়ই নানা রকম খাবার-দাবারের আয়োজন করে, আজও করেছে। যারা এসেছে তারা এরই মধ্যে মিষ্টিগুলি নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু করে দিয়েছে। নিমচাঁদ এসে কাছে দাঁড়াল, কিন্তু কেউ তার দিকে ভ্রূক্ষেপও করল না। নিমচাঁদের মনে হল এই সব সদ্য তরুণদের আসরে তার কোন স্থান নেই, চেহারায় যাই হোক, মনের দিক থেকে তার সঙ্গে এদের কোন মিল নেই। এখন ওদেরকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে সরে যাওয়াই তার কর্তব্য। নিমচাঁদের পরে সুন্দরলালই এ আসরে অনেক বেশি মানান সই।

একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সকলের চোখের আড়ালে ধীরে ধীরে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

আমার ইচ্ছে

কালিদাস ভট্টাচার্য

আমি এখন একটি টাকার মালিক
কিনতে পারি মাটির ছোট শালিক।
আমার হাতের এই টাকাটি দিয়ে
দিতে পারি এক পুতুলের বিয়ে।
কিন্তু আমার ইচ্ছে অনেক বড়
বলছি সেটা একটু সবুর কর।
এই টাকাতে গরীব দুখীর তরে
রাখবো আমি খাবার কিনে ঘরে।
তাদের হাতে খাবার দিতে চাই
ইচ্ছেটা মোর নয়কি ভালো ভাই ?

আকাশে বাতাসে

অজিতকুমার দাস

লাফায় শালিক,
লাফায় চড়ুই,
লাফায় টিয়া, ময়না ;
আপন মনে খেলার ঘরে
খুকু বসে চুপটি করে
কোন কথাই কয় না।
দেখছ চেয়ে খেলার ফাঁকে,
কেমন করে ঝাঁকে ঝাঁকে
উড়ছে পাখী আকাশে।
বাগান থেকে কাপাস তুলো
তার সাথে ঐ পায়ের ধুলো
উড়ছে কেমন বাতাসে।

অনির কুকুর

বিজন কুমার ঘোষ

অনি ইদানীং খুব মুশকিলে পড়ে গেছে। প্রথমে কথাটা হাবুলের কাছে শোনে। কিন্তু বিশ্বাস হয় নি। পুলিসের চরিত্র খারাপ হয়েছে—এ হতেই পারে না। পরে মার কাছেও একদিন কথা শুনতে হল, হ্যাঁরে অনি আজকাল আমার পয়সা-টয়সা চুরি হচ্ছে কেন রে? খোঁজ নে তো।

অনির প্রিয় কুকুরের নাম পুলিস। রাস্তা থেকে যখন ধরে এনেছিল বুকের সব ক'টা হাড়ই গোনা যেত বেচারার। সারা শরীরে একটিও লোম নেই, তার ওপরে ঘা। চব্বিশ ঘণ্টা মাছি বসে থাকে। সবাই দুরছাই করতে লাগল। বাবা বললেন, তোর কি আক্কেল, পছন্দ বলে কিছু নেই! ফেলে দিয়ে আয় ডাস্টবিনে। অনি কিন্তু এতে একটুও ঘাবড়ে যায় নি। বরং জেদই বেড়ে গেছে। ওর কাছে কুকুরটা ছিল একটা চ্যালেঞ্জ বিশেষ। তা তিন মাসের প্রবল যত্নে ও তীব্র ইচ্ছাশক্তিতে অনি সাকসেসফুল হল। পুলিসকে আর চেনাই যায় না। দিব্যি নাদুসনুদুস। সারা গায়ে ঘন লোম। মুখে আলগা শ্রী। বাড়িতে এখন একটা কাকও বসতে পারে না। আর অসাধারণ আই কিউ।

তনুপুকুর রোডে হাবুলের অনেক দিনের একটা ছোট চায়ের দোকান আছে। আলুর দম, ঘুগনি, ডিমের কারি পাওয়া যায়। বয়মে থাকে কেক, বিস্কুট, পাঁউরুটি। হাবুলের সঙ্গে পরামর্শ করে অনি ঠিক করল ব্যাপারটা হাতেনাতে ধরতে হবে। দোকানের সামনেই ওর বন্ধু তপুদের বাড়ি। অনি একদিন সেখানে লুকিয়ে রইল। বেলা তখন দশটা। প্রায় কুড়ি মিনিট অপেক্ষা করার পর দেখা গেল ছুটতে ছুটতে পুলিস আসছে। তারপর হাবুলের দোকানের সামনে মুখ থেকে গোটাকয়েক খুচরা পয়সা ফেলে দিয়ে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল। অনি তো তাজ্জব। পয়সা চুরি করে খাবার খাওয়া হচ্ছে। পেটে পেটে এত বুদ্ধি! হাবুল একটা প্লেট ঘুগনি আর দু'পিস পাউরুটি বেড়ে দিল। আরে, এ যে মানুষের মতো আদব-কায়দা! হাবুল বলে, আমি যদি খাবার না দিই তো আমার পাজামা কামড়ে ধরে। কি বড় বড় দাঁত খোকা-বাবু! আমার ভয় লাগে।

এ তো গেল খাবার খাওয়া। এবার পয়সাচুরির কায়দাও ধরে ফেলতে হবে। একদিন মার ঘরে আপাদ-মস্তক চাদরমুড়ি দিয়ে মড়ার মতো শুয়ে রইল অনি। খাটের নিচে বহুদিনের একটা টিনের বাক্স আছে। তাতে তালা নেই। মা'র হাতখরচের খুচরো পয়সা এখানেই থাকে। বেলা দশটার কিছু পরে পুলিস চোরের মতো ঘরে ঢুকলো। মা রান্নাঘরে ব্যস্ত। ঘরে আর কেউ নেই। তা সময়টা বেশ ভালই বেছেছে। পুলিস ঠেলে ঠেলে বাক্সটাকে দেওয়ালের কাছে নিয়ে গেল। তারপর মুখ দিয়ে চেপে ডালাটা খুলে ফেলল। পয়সা নিয়ে বাক্সটাকে আবার আগের জায়গায় রেখেও দিল। কি নিখুঁত কাজ! পাড়ার পাকা চোর হরিও পুলিসের কাছে হার মানবে। আনন্দে ও গর্বে চাদরের তলায় অনির বুকটা ফুলে উঠল। আবার দুঃখও হল একটু। আহারে, এই বুদ্ধিটা যদি সৎপথে যেত, তা হলে দেশের কত উপকারে লাগত।

অনির পরম বন্ধু সেজকাকা। রাত্রে বাড়ি ফিরলে অনি গম্ভীরমুখে পরামর্শ করতে বসল।

—জান সেজকাকা, আমাদের পুলিস আর যে পুলিস নেই।

—কেন রে, কি হল?

অনি তখন যা যা দেখেছিল, সব বলে শেষে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা যদি বেলগাছিয়ার ভেটিরিনারি কলেজে ওকে নিয়ে যাই?

সেজকাকা বলল, কিছু হবে না। ভেটিরিনারি

কলেজে শুধু চিকিৎসা হয়। পুলিসের চরিত্র-সংশোধন তোমাকেই করতে হবে।

—সেটা কিভাবে?

—তা তুমিই জান! যে ভাবে নেড়িকুত্তার গায়ে লোম গজিয়েছ, ঠিক সেইভাবে।

এখন এটাও অনির কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। ও এতে ভয় পায় না। তক্ষুনি চিন্তা করতে বসে গেল। পুলিসের আই কিউ আছে আর তার মনিবের থাকবে না, এ কখনো হয়? উপায়ও একটা হয়ে গেল। অনি ইলেকট্রিকের কাজ কিছু কিছু জানে। সেজকাকার সঙ্গে সঙ্গে থেকে শিখে নিয়েছে। আর এটা যখন বিজ্ঞানের যুগ তখন বিজ্ঞানের আশ্রয় নেওয়াই তো সবচেয়ে ভাল। পরদিন সাড়ে ন'টার সময় অনি বাক্সের সঙ্গে ইলেকট্রিকের তার দিয়ে সুইচে কানেকসন ক'রে দিল। ডি. সি. কারেন্ট। সোয়া দশটা, দশটা বাইশ, দশটা সাতান্ন—গুনে গুনে এই তিনবার শক্ খেয়ে বেচারা ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল। চাদরের তলায় অনির সে কি হাসি! ব্যস, হাতে হাতে ফল—চিরতরে চরিত্র-সংশোধন। আর কখনো পুলিস হাবুলের দোকানে খাবার খেতে যায় নি।

সত্যি, সরষের মধ্যে ভূত থাকলে কখনো চলে!

———

সঙ্গীত ও শরৎচন্দ্র

শৈলেন কুমার দত্ত

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের গান বাজনায় খুব ঝোঁক ছিল। তিনি একটা খাতায় অনেক গান লিখে রাখতেন। ওই গানের খাতায় অনেক রচনারও তিনি খসড়া লিখেছিলেন। গানের গলাও তাঁর মন্দ ছিল না। মাঝে-মাঝে গান গাইতেন।

কিন্তু গান ভালবাসলেও সঙ্গীতানুষ্ঠানে তিনি যেতে চাইতেন না।

একবার তিনি এ নিয়ে একটি বেশ মজার গল্প বলেন। সেবার শরৎচন্দ্রকে নিয়ে গিয়ে একটি সঙ্গীত সভার সভাপতি করা হয়েছে। একজন ওস্তাদ গান ধরেছেন। তিনি এক কলি করে গান আর হেঁচকি তুলে প্রশ্ন করেন: সৈঁয়া তু কাঁহা গেঁইয়া!

এমন ওস্তাদী গান আর ক'জনের ভাল লাগে? দেখতে দেখতে সভা প্রায় ফাঁকা হয়ে এল। শরৎচন্দ্র পড়লেন মহা বিপদে। সভাপতি তো আর চলে যেতে পারেন না।

ধৈর্য ধরে রইলেন অনেকক্ষণ। কিন্তু আর থাকতে পারলেন না। ওস্তাদজীকে বললেন—সৈঁয়া কাশীমিত্তিরের ঘাটে গেঁইয়া, তারপর বলুন!

সেই থেকে তাই তিনি বড় একটা সঙ্গীত সভায় যেতেন না।

একবার দিলীপকুমার, ধূর্জটিপ্রসাদ, অতুলপ্রসাদ তিনজনে মিলে শরৎচন্দ্রকে ধরলেন একজন মস্ত বড় ওস্তাদের গান শুনতে যাবার জন্যে।

শরৎচন্দ্র বললেন—বড় বড় ওস্তাদের গান শোনা আমার পোষায় না।

অনেকক্ষণ অনুরোধ করার পর শরৎচন্দ্র তখন জিজ্ঞেস করলেন—মস্ত বড় ওস্তাদ বলছ, কিন্তু থামে তো?

—একথা জিজ্ঞেস করার মানে? অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন তাঁরা।

শরৎচন্দ্র তখন সেই অতীতের অভিজ্ঞতার কাহিনী বললেন। শুনে সকলে হেসেই খুন।

এসব নিয়ে পরিহাস করলেও তিনি কিন্তু গান বাজনা খুবই ভালবাসতেন। ইন্দ্রনাথের বাঁশির মিষ্টি সুর শুনতে শ্রীকান্ত যে কত ভালবাসত, সে গল্প তো তোমরা জানো!

অনেকে বলেন এসব তাঁর নিজের জীবনেরই ঘটনা।

———

স্নেহের মূল্য

রত্নমানিক দাশ

আট-নয় বছরের মেয়ে রিনা ও তার বাবা-মা, আর শ্যামলীকে নিয়ে তাদের ছোট সংসার। রিনা প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই আগে যায় শ্যামলীর উদ্দেশ্যে। শ্যামলীকে কখন খেতে দেবে, দড়ি ধরে কখন ঘাস খাইয়ে আনবে·········এইভাবে শ্যামলীকে নিয়ে কিশোর মনে আনন্দের ঢেউ বয়ে যায় সারাদিন।

শ্যামলী পশু হলেও রিনার আদর সে বোঝে। রিনা যখন তার গলায়-গায়ে হাত বুলায়, তখন শ্যামলী স্নেহের পরশে রিনার মাথা চাটতে থাকে।

······দুপুরবেলা যখন আসে, শ্যামলী চেয়ে থাকে রিনার আসার প্রতীক্ষায়। কখন ভাতের ফেন, জাব খেতে দেবে ; রিনা যখন একবাটি ফেন এনে শ্যামলীর মুখের সামনে ধরে, তখন শ্যামলীর চোখে-মুখে ফুটে উঠে স্নেহসুলভ দৃষ্টি, কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে নীরবে। তারপর খেয়ে নেয়। এইভাবে দিন যায়···

কিন্তু হায়, দারিদ্র্যের কালোছায়া নেমে এলো রিনাদের সংসারে। পেটের দায়ে সব জিনিস রিনাদের বিক্রি করে দিতে হলো। তাতে আর ক'দিন চলে, তারপর আবার যে-কে সেই। তাই রিনার বাবা ঠিক করলো, এবারে শ্যামলীকে বিক্রি করে দেবে।

একদিন রাত্রিতে গোপনে রিনার বাবা শ্যামলীকে বিক্রি করে দিল কয়েকটি টাকার বিনিময়ে। রিনা তখন ঘুমাচ্ছিল। সকালে উঠেই রিনা আগের মতো ছুটে গেল গোয়ালঘরে। শ্যামলী নেই দেখতে পেয়ে, গেল মায়ের কাছে,--মা, শ্যামলী কোথায় ? মা করুণস্বরে বলে, তাকে তোর মামার বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি। আর দু'মাস পরে ওর বাচ্ছা হবে। এখানে ওকে খাওয়াবার মতো কিছুই নেই—কি খেয়ে বেঁচে থাকবে বল ?······ সেখানে থাকলে ভাল করে খেতে পারবে, কত মোটা হবে, তবে তো অনেক দুধ দেবে।

রিনা বয়সে ছোট হলেও বুঝতে পারলো যে বাবা শ্যামলীকে বিক্রি করে দিয়েছে।

······রিনা শ্যামলীর কথা কত ভাবে ; চোখে ঘুম নেই, খাওয়া নেই, কেঁদে কেঁদে শুকিয়ে যায় রিনা। শুধু শ্যামলী আর শ্যামলী······মা-বাবা চিন্তিত হয়ে পড়েন।····দেখতে দেখতে মাস দুই কেটে গেল। ঘরে আর কিছুই নেই ; খাবার পর্যন্ত নেই। দারিদ্র্যের অভিশাপ

একদিন কিসের ডাকে রিনার ঘুম ভেঙ্গে গেল। রিনা কাউকে না বলে ঘরের বাইরে এসে দেখে তার শ্যামলী ডাকছে আর তার সঙ্গে দুধের মতো সাদা ক্ষুদে একটা বাচ্ছা। আনন্দ দেখে কে রিনার, আনন্দ চিৎকারে জেগে উঠলো মা, বাবা। বাইরে এসে দেখে রিনা ও তার আদরের শ্যামলী, সঙ্গে একটা ফুটফুটে বাচ্ছা। রিনা শ্যামলীর গলা জড়িয়ে—আর শ্যামলী তার মাথা চাটছে। রিনার বাবা এতক্ষণ সব দেখছিল। রিনাকে তারপর বললো, রিনা! তোর আদরের শ্যামলীকে গোয়ালঘরে নিয়ে যা। রিনা আনন্দে জিজ্ঞাসা করে, নিয়ে যাব বাবা ? রিনার বাবা বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি যা করেই হোক, টাকা ক'টা শোধ করে দেবো।

কথার কথা

১। ইঁট মারলেই পাটকেলটি খেতে হয়—
তাতে রাগ করলে তো চলবে না ?

২। আমার কুকুর, আমি ল্যাজই কাটি আর
কানই কাটি, তোমার তাতে কি ?

কোথায় আছে ?

১। শরৎচন্দ্রের 'বৈকুণ্ঠের উইল'

২। অমৃতলাল বসুর 'নবযৌবন'

বাংলার ডাকাত

ডাঃ শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

ভৈরব নদী সে দিন খেপে উঠেছিল।

একটু আগে ঝড় বৃষ্টি হয়ে গেছে। ঢেউগুলো ফুলে ফুলে উঠছে। গর্জন করছে ক্রুদ্ধ ফণীর মতো।

সেই জল কেটে মাছের মতো সাঁতার কেটে চলছে কুলপী খান। এই অঞ্চলের বিখ্যাত ডাকাত। ভৈরব, জিনারদী, নারায়ণগঞ্জ হতে মেঘনার পাড় —খানের দাপটে কাঁপে এখানকার মানুষ।

তার পিছনে নৌকো করে ছুটছেন এই অঞ্চলের রেভিনিউ কলেক্টর মিঃ টমসন। দুর্দান্ত প্রকৃতির মানুষ। ওর নামেও কাঁপে এই সব অঞ্চলের জমিদার-গোষ্ঠী।

কুলপী খান এসেছিল ভৈরববাজারে সওদা করতে। পুলিসের সাহায্য নিয়ে মিঃ টমসন ছিলেন ওৎ পেতে। কুলপী খানকে ধরতে পারলে, পেয়ে যাবেন দশ হাজার টাকা। বাংলার সরকার পুরস্কার ঘোষণা করেছেন—জীবিত কি মৃত যে অবস্থায় খান সাহেবকে ধরে দেবে তাকেই দেবেন এই টাকা।

কুলপী খানের আগমন-খবর পেয়েছিলেন—মিঃ টমসন। পুলিস নিয়ে ঘাপটি মেরে বসেছিলেন। কুলপী খান সওদা করতে ভৈরববাজারে এলেই ধরবেন।

কুলপী খানও কম হুঁশিয়ার নয়। ভৈরববাজারে পা দিতেই বিপদের গন্ধ তার নাকে গেল। তারও চর রয়েছে বাজারে সর্বত্র।

কুলপী খান চাউলের দোকানে বসে দরদাম করছিল। এমন সময় মিঃ টমসন পুলিস নিয়ে হাজির।

হুঁশিয়ার লোক কুলপী খান। মুহূর্তে তার অবস্থা বুঝে নিল। মিঃ টমসন বন্দুক বাগিয়ে কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন। কুলপী খান বিদ্যুৎবেগে তাঁর উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। হঠাৎ এভাবে আক্রান্ত হয়ে মিঃ টমসন টাল সামলাতে পারেন নি। একদম মাটিতে পড়ে গেলেন। সঙ্গীরা হতভম্ব। তারা তাড়াতাড়ি মিঃ টমসনকে টেনে তুললেন।

মিঃ টমসন উঠেই ছুটলেন খানের পিছু পিছু। সর্বত্রই রব উঠলো, ধর—ধর—পালাল। কুলপী খান তখন ভৈরববাজারের লোকের মধ্যে মিশে গেলো।

মিঃ টমসন চিৎকার করছেন অনবরত—ডাকু ডাকু—ধর ধর। কিন্তু বাজারশুদ্ধ মানুষ হাঁ করে চেয়ে রইল। কোথায় ডাকু—কি ব্যাপার!

খান সাহেব ছুটতে ছুটতে ভৈরব নদীর কাছে এসে পড়লো। নদীর কিনারায় নৌকোর ভিড়। শ'য়ে শ'য়ে নৌকো আসছে সওদা নিয়ে। যাচ্ছে ও শ'য়ে শ'য়ে নৌকো। চেঁচামেচি হৈচৈ-তে মুখরিত ভৈরব ঘাট। খান সাহেব এক নৌকোর উপর দিয়ে আর একজনের নৌকোর গা বেয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়লো জলে। নদী তখন গর্জন করে আছাড় খেয়ে পড়ছে তীরের উপর। বৃষ্টি থামলেও ঝড়ের তাণ্ডব চলছে।

মিঃ টমসনও একটু পরে ঘাটে এসে দাঁড়ালেন। খান সাহেব তখন জলে ঝাঁপ দিয়েছে।

টোমরা ধরলে না কেন, ওকে। ও ডাকাত—কুলপী খান। গর্জন করে উঠলেন মিঃ টমসন।

—আমরা বুঝি নি হুজুর। ঝড়ের জন্য মালপত্র সামলাতে ব্যস্ত ছিলাম।

মিঃ টমসন বললেন, শীগগীর একটা খোলা নৌকো দাও। আমি ওকে ধরব।

নৌকোয় চড়ে মিঃ টমসন ছুটলেন খান সাহেবের পিছন পিছন। আকাশ তখন গজরাচ্ছে।

নৌকোর দাঁড় পড়ছে ঝপাঝপ। আধ মাইল দূরে খান সাহেব জল কেটে চলেছে।

তখন মধ্যাহ্নকাল। সূর্য মেঘে ঢাকা। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ঘন ঘন। মিঃ টমসন দেখতে পাচ্ছে কুলপী

খানের মাথা, আর ঢেউর উপর হাত দুখানি দাঁড়ের মতো ওঠানামা করছে।

গুড়ুম, গুড়ুম, বন্দুক চালালেন মিঃটমসন। কিন্তু অত দূর গুলি গিয়ে পৌঁছল না।

ননসেন্স! মিঃ টমসন গর্জন করে উঠলেন। আবার ফায়ার করলেন—গুড়ুম—

হুজুর, খান সাহেব ডুবছে। আনন্দে চিৎকার করে উঠল এক সিপাই—ঐ দেখুন হুজুর, হাত তুলে সাহায্য চাইছে।

নিশ্চয় আমার গুলি লেগেছে। জলদি চালাও।

কিন্তু জলদি কি চলা যায়। ঢেউয়ের উপর ঢেউ এসে বাধা দিচ্ছে।

হাতও ডুবে গেল। সকলে আনন্দে চিৎকার করে উঠল। খান সাহেবের খেলা খতম।

মিঃ টমসন আনন্দিত। তাঁর শত্রু শেষ। এবার নিশ্চিন্ত হয়ে কাজকর্ম করা যাবে। নৌকো তাদের ডাঙার দিকে নিয়ে চলল।

হঠাৎ মিঃ টমসন দেখলেন, ডাঙার ধারে মানুষের মাথা ভুস করে ভেসে উঠল। তারপরই সমস্ত শরীরটা ধীরে ধীরে উঠে এল জল থেকে। খান সাহেব তবে মরে নি। কুমীরেও ধরে নি। এতক্ষণ ডুবসাঁতার দিয়ে এসেছে। কি সাংঘাতিক এই কুলপী খান। রেগে মেগে মিঃ টমসন হুকুম দিলেন—ফায়ার—

একসঙ্গে পাঁচ জন সিপাহী ফায়ার করল। কপাল ভাল একটাও গুলি খান সাহেবের গায়ে লাগল না।

খান সাহেব ডাঙায় উঠে গেলেন। একবার পিছন দিকে ফিরে তাকালেন, নৌকো ডাঙার কাছে এসে পড়েছে। খানসাহেব ডাঙায় উঠে দৌড়াল।

তখন ইংরাজ রাজত্বের মধ্য যুগ। ভৈরবে রেল লাইন তখন বসে নি। লোকেরা নৌকো, জাহাজ, লঞ্চে করে যাতায়াত করে, মালপত্র বয়ে নিয়ে যায়। ডাঙার কাছে অনেক নৌকো।

মিঃ টমসন হাঁকলেন চুঙ্গিতে মুখ দিয়ে—ওকেধরো, ও ডাকাত! কিন্তু মিঃ টমসনের কথায় কোন কাজ হল না।

দেখতে দেখতে নৌকো এসে ডাঙায় ভিড়ল। মিঃ টমসন সর্বপ্রথম লাফ দিয়ে ডাঙায় নামলেন। তার পিছনে নামল সিপাইর দল। গ্রাম লক্ষ্য করে মিঃ টমসন ছুটলেন।

গ্রামে ঢুকবার মুখে এক মাটির ঘর। তার দরজার সামনে বসে এক বুড়ী কাঁথা সেলাই করছিল। সেখানে কুলপী খান এসে হাজির। তার পা টলছে—কাপড় ভেজা।

বুড়ী বলল, কুলপী না

হ্যাঁ! মাসী! আমি বড্ড ক্লান্ত। পুলিস তাড়া করেছে। হয় ত এক্ষুনি এসে পড়বে! আমায় একটু আশ্রয় দাও, মাসী।

মাসী খ্যাক করে উঠলো, বলল, তুই মরবি, এতদিন মরিস নি, তোর চৌদ্দ পুরুষের ভাগ্যি। যা ঘরে গিয়ে চালের মাটির জালার ভেতর গিয়ে ব স থাক্।

সারা উঠোন বৃষ্টির জলে ভিজা। পায়ে কাদা, তাই নিয়ে ঘরে ঢুকলো খান সাহেব। বুড়ী তাড়াতাড়ি নেকড়া দিয়ে খান সাহেবের পায়ের দাগ মুছতে লাগল।

এমন সময় মিঃ টমসন হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির। বুড়ীকে দেখে মিঃ টমসন বললেন, হেই বুড়ী তোর ঘরে লোক ঢুকেছে—ইয়া বড় জুয়ান লোক?

বুড়ী মুখ তুলে বলল, না বাবা। আমি একা থাকি। আমার ঘরে লোক কেন ঢুকবে।

মিঃ টমসন ঘরের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দেখে ঘরের মধ্যে দু-চারটা জিনিস পত্র। মানুষ জন নেই।

মাথাটা ঘর থেকে বার করে মিঃ টমসন বললেন, কাউকে দেখেছিস, এখান থেকে যেতে?

বুড়ী বলল, দেখেছি, মিসকালো একটা লোক। ভিজে সপসপে তার কাপড়।

উৎসাহিত হয়ে উঠলেন মিঃ টমসন। বললেন, কোন্ দিকে গেল বল্ ত?

বুড়ী বলল, তা পারব না কেন? লোকটা ঐদিকে গেছে বাবা। তুমি ওদিকে যাও। বুড়ী গ্রাম দেখিয়ে দিল।

ধন্যবাদ দিয়ে মিঃ টমসন গ্রামের দিকে ছুটলেন।

বুড়ী এদিক্ ওদিক্ ভাল করে তাকিয়ে দেখল, তারপর ডাকল—কুলপী—ও কুলপী বেরিয়ে আয় বাবা!—

ফিস্ ফিস্ করে কুলপী খান বলল—ওরা গেছে মাসী! বলে মাটির জালা থেকে বের হল।

বুড়ী বলল এই ফাঁকে পালা।

কুলপী বলল, বড্ড বাঁচিয়ে দিলে মাসী। এবার ধরতে পারলেই ফাঁসী। কারোর বাবার ক্ষমতা ছিল না বাঁচায়।

বুড়ী বলল, এসব ছেড়ে দাও বাবা। কখন বেঘোরে প্রাণটা যাবে—

খান সাহেব একটু হাসল, বলল, মাসী—আমি ইংরেজদের দুচোখে দেখতে পারি নে। আর পারি নে

কুলপী খান বিদ্যুৎবেগে তাঁর উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ল (পৃঃ ২৭)

বড়লোকদের। এরাই ত যুক্তি করে ইংরেজদের ডেকে এনেছে। সোনার বাংলা বানরের হাতে তুলে দিল। এখন ওরা লুটপাট করে খাচ্ছে। গরীবরা খেতে পায় না, দেশ জুড়ে হাহাকার। এর জন্যই আমার লড়াই।

তা বাবা তুমি একা কি করবে?

খান সাহেব বলল, আমি একা যে পারব না তা আমিও জানি। কিন্তু মাসী! যারা এক সেরও নুন কিনতে পারে না, তাদের টাকা খাজনার নামে লুট করে নিয়ে যায় মাসী। আমি চাই তাদের মুখে একটু হাসি ফুটাতে, তারা নুন ভাত খেয়ে বাঁচুক।

মাসী অত শত বুঝল না। বলল, তুই পারবি বাবা? সত্যি আমরা খুব গরীব। প্রতিদিন পেট ভরে চাট্টি ভাত খাব, তার কোন উপায় নেই। তার উপর সকলেই আমাদের শোষণ করে। আমাদের ভগবান ছাড়া আর কেউ নেই।

খান সাহেব হাসল, বলল, মাসী! আমার মতে ভগবান নেই; আল্লাও নেই। থাকলে দেশের গরীব মানুষের এ হাল হত না। দেশের মানুষের উন্নতি হত। আর যারা ভণ্ড, দেশ গড়ার নামে গরীবের টাকা লুটে-পুটে খায়—সেই সব ভণ্ড বদমাস্‌দের ধ্বংস হত।

গ্রামের দিকে খুব হৈ-চৈ চলছে। বুড়ী বলল, ওসব কথা থাক বাবা। তুই পালা। সাহেবটা খ্যাপা কুকুর হয়ে আছে।

কুলপী খান আর কথা বলল না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বুড়ী ঠিক কথাই বলেছিল, মিঃ টমসন সত্যিই খ্যাপা কুকুরের মত ঘুরছে। যাকে পায় তাকেই বলে কুলপী খানের কথা। ছেলেরা মজা পেয়ে গান ধরলো, নাচতে নাচতে গেয়ে উঠল ঃ

"ও সাহেব কলা খাবি
জয় জগন্নাথ দেখতে যাবি
একটা করে পয়সা পাবি।"

টমসন বলেন, কলা খাব—নিশ্চয় খাব—কিন্তু আগে কুলপী খানকে ধরিয়ে দাও।

ছেলের দল হো-হো শব্দে হেসে ওঠে। সাহেব অবাক হয়ে ভাবে এর ভিতর হাসবার কি আছে! সে বোকার মত এদিক ওদিক চাইল। একটি ছেলে জানালা দিয়ে কলা ছুড়ে দিল—বলল, যা বাঁদর খা—কলা খা।

ভেরি গুড্ বলে টমসন কলা তুলে খেতে খেতে চলল। সারা গ্রাম খুঁজেও কুলপী খানের টিকির দর্শন পেল না।

জমিদার মহলের মধ্যে ব্যস্ততা দেখা দিল। পৌষ মাসের শেষে তাদের খাজনার টাকা মিঃ টমসনের কাছে পৌছিয়ে দিতে হবে। একদিন দেরী হলেই হাজত বাস। টাকা আদায় হচ্ছে গরীবের বুকের রক্ত শোষণ করে। চারিদিকে হাহাকার, ক্রন্দন উঠছে গরীবের ঘরে ঘরে। পাগলের মত পেয়াদারা ঘুরছে লাঠি হাতে। যার ঘরে যা পাচ্ছে, টাকা-কড়ি, গহনা, এমন কি ঘটি বাটিটুক কেড়ে নিচ্ছেন জমিদারের লোক। তাঁর মুখে এক কথা—খাজনা চাই খাজনা দাও। নইলে কয়েদ ঘরে চল।

কুলপী খান দেখে শুনে হাঁপিয়ে উঠল। সারা রাজ্য জুড়ে ঘরে ঘরে কান্না। নিজের যা পুঁজি ছিল গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দিল। কিন্তু তা কতটুক। গরীবের একশ ভাগের দশ ভাগও উপকৃত হল না। রাগে দুঃখে হাত কামড়াল কুলপী খান।

জিনারদীর মধ্যে গায়েশপুরের জমিদারের খুব নাম। ছোট জমিদার। আয় কম। তথাপি তিনি গরীব চাষীদের উপর পীড়ন করে টাকা আদায় করেন না। ফলে রেভিনিউর টাকা বাকি পড়ে গেল। সকলে বলল গরীব চাষীদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে নিন হুজুর।

চন্দ্রগুপ্ত চৌধুরী মশায় বললেন, ও আমি পারব না নায়েব মশায়, নিজের বিপদের জন্য অন্যের টাকা জোর করে আদায় যে করে করুক আমার দ্বারা হবে না।

জমিদারি যে লাটে উঠবে। হুজুরের কয়েদ হবে। সে কি ভাল কথা।

চৌধুরী মশায় বললেন, ধার নাও।

নায়েব মশায় বললেন, এ সময় কে ধার দেবে। সকলেই যে বিপদগ্রস্ত হুজুর। এখন ত সকলকেই লাটের টাকা দিতে হবে।

বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেল। খাওয়া দাওয়া বন্ধ। গম্ভীর মুখে চন্দ্রগুপ্ত চৌধুরী মশায় বসে রইলেন। আগামী কালই টাকা পাঠাবার শেষ দিন। তার পরদিনই, মান সম্মান, জমিদারি সবই যাবে। কেউ তাঁর দিকে ফিরেও চাইবে না। বসে বসে চিন্তা করছেন জমিদার মশায়। এমন সময় লুঙ্গী পরা এক জোয়ান মুসলমান জমিদার মশায়ের কাছে এসে দাঁড়াল।

সেলাম কর্তা!

কে-কে তুমি? চমকে উঠলেন জমিদারবাবু।

আমি কুলপী খান।

থর থর করে কেঁপে উঠল কাছারীশুদ্ধ মানুষ। কুলপী খান বিখ্যাত ডাকাত। যার নামে ইংরেজরাও ভয়ে কাঁপে। জমিদার চেয়ে রইলেন।

কুলপী খান বলল, ভয় নেই কর্তা। আমি ডাকাতি করতে আসি নি। আমি শুনলাম, খাজনার টাকা আপনার বাকি পড়েছে, আদায় হয় নি। বাকি টাকা দেনা করে খাজনা দিতে চান। এই নিন টাকা—লাটের খাজনা শোধ করুন!

এবার জমিদার বাবুর ভয় দূর হল। বললেন, কিন্তু ভাই আমি ত দু এক মাসের মধ্যে শোধ করতে পারব না তোমার টাকা।

যখন সুবিধে হবে দেবেন। সেলাম কর্তা—আসি।

আবার দেখা হবে কর্তা—তখন টাকা চেয়ে নেব।

একটা কথা খান সাহেব। এ টাকাটা দিলেন কেন খান সাহেব? আমাকে ডোবাবার জন্যে?

না কর্তা। আপনাকে বাঁচাবার জন্যে। এ অঞ্চলে হাজার হাজার জমিদার আছেন। সকলেই গরীব চাষী ভাইদের পীড়ন করে টাকা আদায় করে নিয়েছে, লাটের টাকা দেবার জন্যে। করেন নি শুধু আপনি। নিজেদের স্বার্থের জন্যে।

আপনি এক মাত্র জমিদার প্রজাদের সত্যি মঙ্গল চান। তাই আপনার বিপদ দেখে স্থির থাকতে পারলুম না কর্তা। তাই দিয়ে গেলুম—সেলাম—

কুলপী খান অদৃশ্য হয়ে গেল।

চন্দ্রগুপ্ত চৌধুরী ত আকাশ থেকে পড়লেন। এমন মহৎ হৃদয় যার তাকে লোকে বলে ডাকাত! কথা নেই, বার্তা নেই, কাগজে লিখতে হল না, এক থলি টাকা দিয়ে গেল। কবে দেব, তাও জিজ্ঞাসা করল না। এত উদার মানুষকে তারা কিনা ডাকাত বলে উপহাস করত।

চন্দ্রগুপ্তের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। এ বিপদে কুলপী খানই এগিয়ে এলো। ভাবতে ভাবতে ঘরের ভিতর চলে গেলেন জমিদার বাবু।

মিঃ টমসন খুব খুশী। অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছরের রেভেনিউ বেশী আদায় হয়েছে। দুজন জমিদারকে কারাগারে দিয়েছেন।

বহু টাকাকড়ি সোনাদানা নিয়ে মিঃ টমসন নারায়ণগঞ্জে রওনা দিলেন লঞ্চে করে। সঙ্গে অনেক সিপাই।

লঞ্চ ভৈরব নদী ছেড়ে মেঘনায় পড়েছে। লঞ্চ ছুটছে দশ মাইল বেগে! বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে টাকা পয়সার হিসাব করছেন মিঃ টমসন।

হঠাৎ কার স্পর্শ পেয়ে চমকে উঠলেন। ভয়ে ভয়ে বললেন—কে-কে?

—তোমাদের যম!

—ও কুলপী খান। পিস্তল তুললেন মিঃ টমসন। এক ঝাটকায় পিস্তল কেড়ে নিল কুলপী খান। বলল, আসবার সময় মা মাথার দিব্বি দিয়েছেন যেন তোমাকে না মারি। নইলে এতক্ষণে তোমাকে মেঘনার জলে ডুবাতাম। আমরা ভারতবাসী। মার আজ্ঞা অবহেলা করতে পারি না।

—তুমি ডাকাত। পরের টাকা লুট কর। এর ফল তোমাকে ভুগতে হবে।

খান সাহেব হাসল। বলল, কে বলে এ পরের টাকা। এ টাকা আমার দেশবাসীর। তুমি সেই টাকা লুট করে মজা করছ। আমি তা দেব না। সেলাম সাহেব।

মিঃ টমসন চিৎকার করে উঠল, সিপাহী, ডাকাত, ডাকাত!

খান সাহেব হাসল। বলল, বৃথা তোমার চিৎকার। আমার লোকেরা ওদের বেঁধে রেখেছে। সেলাম সাহেব, সেলাম। এখন বসে বসে টাকার শোকে কাঁদ। বলে কেবিন থেকে বের হয়ে এল। সঙ্গীদের হাতে টাকা দিয়ে খানসাহেব বলল—পানসীতে টাকা নিয়ে যাও। বলে লাফ দিয়ে নামতে যাবে এমন সময় এক সিপাহী তার পেছন থেকে ছোরা বসিয়ে দিল পিঠের উপর।

একটা চিৎকার করে উঠল খান সাহেব। তারপর পাটাতনের উপর শুয়ে পড়ল। মুখ দিয়ে শুধু বের হল—'সাহেবের কুত্তা'।

মিঃ টমসন ছুটে এল। পিস্তলটা তখনও খান সাহেবের হাতে ছিল। তুলে নিয়ে গুলি করল পরপর দুবার। হাহা করে হেসে উঠল, শালা ডাকু!

নারায়ণগঞ্জে যখন পৌঁছল, চারিদিকে শুধু মানুষের মাথা। মিঃ টমসনকে সকলেই বলছে বাহাদুর। এত বড় বিখ্যাত ডাকাতকে মেরেছে। পুলিস এসে লাঠি দিয়ে ভিড় সরিয়ে দিচ্ছে।

সকলের মুখে হাসিখুশী! যাক বাবা! এত দিন বাদে কুলপী খান মারা পড়ল। এ ইংরেজ বাচ্চা বলেই সম্ভব হল! বাঁচা গেল বাবা, দেশ এখন শান্তিতে রাত কাটাবে।

কিন্তু কেউ কুলপী খানের জন্যে এক ফোটা চোখের জল ফেলল না। কেউ বুঝল না কত বড় এক দেশ-প্রেমিককে ইংরেজরা মেরে ফেলল। কেউ ভাবল না সে কথা।

———

নেপোলিয়নের ছেলেবেলা

কালীপদ হোড়

ফ্রান্সের সম্রাট, মস্ত বড় যোদ্ধা নেপোলিয়নের নাম তোমরা বোধহয় অনেকেই শুনেছ। আজ থেকে ২১০ বৎসর আগে কর্সিকা দ্বীপের এক গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর বাবার নাম কার্লো বোনাপার্টি। লেটিজিয়া ছিলেন তাঁর মা। নেপোলিয়নের ভাই-বোনের সংখ্যা তের। তিনি ছিলেন দ্বিতীয়।

ভাই-বোনদের মধ্যে যোগ্যতম ছিলেন নেপোলিয়ন। তাঁর চেহারা তেমন শক্তসমর্থ না হলেও মনের জোর ছিল খুব। যা ভাবতেন তাই করতেন। বেশী মেশামেশি তিনি পছন্দ করতেন না। কিন্তু যারা তাঁর সঙ্গে খেলাধূলা করত তারা সকলেই একবাক্যে নেতা বলে মেনে নিত তাঁকে। এমনি ছিল তাঁর প্রভাব।

বড় হয়ে যখন তিনি সেনাপতি ও সম্রাট হলেন, তখনও সবাই বিনা আপত্তিতে মেনে নিত তাঁর নেতৃত্ব। তাঁর ওপর কথা বলার লোক খুব কম ছিল তখন।

নেপোলিয়নের চরিত্রে পিতার তেজ ও সাহস এবং মায়ের দৃঢ়তার ছাপ স্পষ্ট ভাবে পড়েছিল। বিশেষ করে মা লেটিজিয়া নানা ভাবে নেপোলিয়নের চরিত্র গড়ে তুলেছিলেন। তাই মায়ের প্রতি তাঁর ভক্তিও ছিল অপরিসীম। তাঁর মায়ের একটি গল্প বলি, শোন।

তখন নেপোলিয়ন খুবই ছোট। অন্যান্য ভাই-বোনদের সঙ্গে মিলে তিনি একতলা রান্নাঘরের ছাদ থেকে লাফ দিয়ে পড়ছিলেন বাড়ীর উঠোনে। মহা আনন্দ। হৈ চৈ-এ কান পাতা ভার। হঠাৎ হল কিনা, বাচ্চা নেপোলিয়ন পা হড়কে পড়ে গেলেন উঠোনে। বেশ চোট লাগল পায়ে। বুঝতেই পারছ, চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলেন তিনি। তাঁর মা ছেলের কান্না শুনে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখলেন সব। ছেলে তখনও উঠোনে হাত-পা ছড়িয়ে কাঁদছে। কিন্তু অন্য মায়েদের মত তিনি কিন্তু ছুটে এসে ছেলেকে কোলে তুলে নিলেন না। ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বোকার মত কাঁদলে কখনো কোলে নেব না। এমন কিছু লাগেনি তোমার। যাও, আবার ওঠ ছাদে। গুণে গুণে তিনবার লাফাতে হবে তোমাকে। তবেই নেব কোলে।' বেচারা নেপোলিয়ন! কি আর করেন! খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছাদে উঠে বার বার তিনবার লাফাতে হল তাঁকে।

এমনি ছিল লেটিজিয়ার শাসন। এমন যাঁর মা, তিনি পৃথিবীর সেরা বীর হবেন নাত কে হবেন, বলো!

মনুমেণ্ট, জাদুঘর ও চিড়িয়াখানা

স্যার ডেভিড অকটারলোনী নেপাল যুদ্ধে জয়লাভের পর ঐ যুদ্ধজয়ের স্মারক হিসাবে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার ময়দানে মনুমেণ্ট স্থাপিত করেন। এর উচ্চতা ১৫২ ফুট। এর বর্তমান নাম শহীদ মিনার।

১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার জাদুঘর (Museum) এবং ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী আলিপুর চিড়িয়াখানা (Zoological Gardens) স্থাপিত হয়।

মৃত্যুগুহার বন্দী

রবিদাস সাহারায়

(ধারাবাহিক উপন্যাস)

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

[**আগে যা ঘটেছে ঃ** পিতৃমাতৃহীন সুন্দর ভারতবর্ষ থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় তার কাকার বাড়িতে এল। কাকার ছেলে রাজীব তার সঙ্গী। গুজব শোনা যায়, কালাহারি মরুভূমির কোথাও একটা হারানো শহর আছে। শয়তান বুড়ো কীজুই মাঝে মাঝে লোকদের সম্মোহিত করে সেখানে নিয়ে যায়। একদিন ঘোড়ায় চড়ে রাজীব ও সুন্দর বেড়াতে গিয়ে পথে ঝড়ের মুখে পড়ে গেল। আশ্রয় নিতে বাধ্য হলো এক গুহার মধ্যে। সেখানে কিছুক্ষণ থাকার পর দেখতে পেল একজোড়া সবুজ জ্বলন্ত চোখ। ওটা কি? নেকড়ে? নেকড়েকে গুলি করবার জন্য রাইফেল তুলতে গেল। কিন্তু কোথায় রাইফেল? কোমর থেকে রাইফেল উধাও হয়েছে। অন্ধকারের মধ্যে শুনতে পেল একটা বিকট অট্টহাসি।]

অজানা সেই অট্টহাসিতে গুহাটা কেঁপে উঠলো সেই হাসির মধ্যে যেন দুনিয়ার শয়তানি মিশানো। হাসির শব্দ শুনলে যে কোন মানুষের শরীরের রক্ত হিম হয়ে আসে।

কি বিকট—কি হিংস্র সেই হাসি!

অজানা আশঙ্কায় দু'জন দু'জনকে পরস্পর জড়িয়ে ধরে স্থির হয়ে বসে রইলো। কারুর মুখ দিয়ে কোন কথা বের হলো না।

আবার শোনা গেল সেই বীভৎস হাসি!

সঙ্গে সঙ্গে ভেসে এলো বুনো মানুষের ভাষায় কর্কশ বিকট কণ্ঠের চিৎকার—"শোন, তোমাদের জন্য আমি অনেকদিন ধরে অপেক্ষা করছি। তোমরা আমার বন্দী।"

"বন্দী!"

রাজীব ভয় পেলেও মনে সাহস সঞ্চয় করে বললো, "তুমি কে? আমাদের দিয়ে তোমার কি প্রয়োজন?"

সুন্দর কিন্তু তাদের এই সঙ্কটের মুহূর্তে তার ভাইয়ের নির্ভীকতায় উৎসাহ পেলো না। কারণ এই সব কথাবার্তার কিছুই বুঝতে পারছিল না সে।

"আমি কে—জানতে চাও?" সেই বিভীষিকাময় কণ্ঠস্বর হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, "তবে শোন—আমার নাম কীজুই।"

"কীজুই?" রাজীব ও সুন্দরের বুক কেঁপে উঠলো।

কণ্ঠস্বর আবার বলতে লাগলো,—"আমাকে না চেনে এমন লোক এদেশে নেই। আমাকে সবাই ভয় করে। যদি তোমরা বলো কীজুইকে তোমরা চেন না, তা হলে নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা বলছো।"

সুন্দর ও রাজীব ভাবতে লাগলো, তা হলে জাদুকর কীজুই কি এখনো বেঁচে আছে ? যদিও অন্ধকার তাকে তাদের দৃষ্টির আড়ালে লুকিয়ে রেখেছে তবু সে কি এখন তাদের সামনে ? যদি তাই হয়ে থাকে তবে এখন তাদের সামনে ভয়ংকর বিপদ—তাদের জীবন এখন শয়তান কীজুই-এর হাতের মুঠোয়।

কিন্তু এই বিপদের মুখে সাহস দরকার। নইলে বাঁচার কোন সম্ভাবনা নেই। তাই রাজীব গম্ভীর-কণ্ঠে বললো, "আমরা তোমার কি ক্ষতি করেছি যে, তুমি আমাদের এখানে বন্দী করে রাখতে চাও ?"

কীজুই বললো, "সেটা আমার খুশী।"

—"তা হলে কি সত্যি আমরা বন্দী ?"

—"হ্যাঁ।"

রাজীব বললো, "কিন্তু এটাও জেনে রেখো, আমার বাবা হচ্ছেন ওহাজি জেলা পর্যন্ত এই ভূখণ্ডের মালিক। তাকে তুমি নিশ্চয়ই চেনো। সাবধান, তোমার যা খুশী করবার ক্ষমতা যেন তোমার পাগলামির মাত্রাকে ছাড়িয়ে না যায়।"

কীজুই বললো, "যদি ছাড়িয়ে যায়, তা হলে কি হবে ?"

রাজীব বললো, "যদি আমাদের কোন বিপদ ঘটে, তা হলে তুমিও বিপদের হাত থেকে রেহাই পাবে না।"

কীজুই এবার হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলো। যেন কথাটাকে হেসেই উড়িয়ে দিতে চাইলো সে। বললো, "তা হলে কি তোমার বাবাকে ভয় করে চলবো আমি ? জানো, আমি এই মরুভূমির সর্বময় কর্তা !"

রাজীব বা সুন্দর কোন কথার জবাব দিল না। শুধু যেদিক থেকে কথাগুলো ভেসে আসছিল শঙ্কিত ভাবে সেদিকে তাকিয়ে রইলো।

কীজুই বললো, "আমি এই হারানো শহরের মালিক। কার এমন দুঃসাহস আছে যে, আমাকে অর্থাৎ হারানো শহরের মালিককে ভয় দেখাবে বা কিছু করবে ?"

রাজীব উত্তেজিতকণ্ঠে বলে উঠলো, "মিথ্যা কথা।"

এবার একটু বিদ্রূপের আভাস পাওয়া গেল শয়তান কীজুই এর কণ্ঠস্বরে। সে বললো, "কি বললে ? মিথ্যে কথা ! আমার কি ক্ষমতা আছে তা কি তোমরা দেখতে চাও ? তা হলে একটু অপেক্ষা করো।"

রাজীব আর কীজুই যে ভাষায় কথা বলছিল, সুন্দর কিন্তু তা কিছুই বুঝতে পারছিল না। তাই সে ক্রমশঃ অধৈর্য হয়ে উঠছিল। রাজীবকে সে জিগ্যেস করলো, "আচ্ছা, ঐ ভয় দেখানো লোকটা কি সব বলছে ? কে লোকটা ?"

রাজীব বললো, "ও হচ্ছে কীজুই। মহা শয়তান। ভয় দেখিয়ে আমাদের বিপদে ফেলতে চাইছে। খুব সাবধানে থেকো সুন্দর। ও নিশ্চয়ই আমাদের এখানে আটকে রাখবে।"

সুন্দর বললো, "চলো না এখনি ছুটে পালাই।"

রাজীব বললো, "পালানো খুব মুস্কিল। পালাতে গেলেই ও নেকড়েটাকে আমাদের পেছনে লেলিয়ে দেবে।"

এমন সময় হঠাৎ একটা আলোক জ্বলে উঠে গুহার অন্ধকারকে খান খান করে ভেঙে দিলো। চমকে উঠলো সুন্দর ও রাজীব। গুহার ভেতর এত আলো কি করে এলো ?

সেই আলোয় তারা সামনেই দেখতে পেলো একটা ভয়ঙ্করদর্শন মানুষকে। বয়সে বৃদ্ধ, কুৎসিত চেহারার সেই বুনো মানুষটির গায়ের রঙ বাদামী। দেখলেই মনে যুগপৎ ঘৃণা ও আতঙ্ক জাগে।

ঐ আলোকের মধ্যেই তারা অবাক হয়ে দেখলো, ঐ লোকটার পেছনেই পড়ে আছে তাদের রাইফেল দুটো। আর ঐ ভয়ঙ্কর লোকটার নিজের হাতেও রয়েছে একটা স্বয়ংক্রিয় রাইফেল। অনেক বয়স হওয়া সত্ত্বেও তাকে দেখে মনে হচ্ছিল লোহায় পেটা তার শরীর।

লোকটার বাঁ হাতে ধরা ছিল একটা শক্তিশালী ইলেকট্রিক টর্চ। সুন্দর ও রাজীব বুঝতে পারলো, ঐ টর্চ থেকেই আলো আসছে !

হঠাৎ একটা মৃদু ছটফটানির শব্দ শুনে তারা চমকে উঠে দেখলো লোকটার পাশে বসে আছে একটা বীভৎস নেকড়ে। এত বড় নেকড়ে তারা আগে কখনো দেখে নি।

ভয়ঙ্কর জন্তুটার জ্বলন্ত দৃষ্টি তাদের দিকে।

ভয়ে তাদের বুক কেঁপে উঠলো।

কেটে গেল কয়েকটা মুহূর্ত।

এতক্ষণ কীজুই বসে ছিল, এবার হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে হুকুম করার ভঙ্গিতে বললো, "তোমরা দু'জনেই আমার সঙ্গে এসো।"

রাজীব বুঝতে পারলো না এই অন্ধকার গুহার মধ্যেও আবার কোথায় যাবে তারা? কিন্তু এখন যে অবস্থায় তারা এসে পৌঁছেছে তাতে এই বন্দীশালা থেকে মুক্তির সুযোগের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

সেই কথাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিল সে। বুড়ো আবার ধমক দিয়ে বলে উঠলো, "চলো!"

টর্চের আলোয় তারা দেখলো গুহাটা বেশ লম্বা। কীজুই সেদিকে যাবার জন্য তাদের নির্দেশ করলো। অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজীব ও সুন্দর পা বাড়ালো।

আগে আগে চললো রাজীব ও সুন্দর—তাদের পেছনে কীজুই। মাঝখানে চলতে লাগলো নেকড়েটা, একটা বড় পোষা কুকুরের মতো। শক্ত পাথরের মেঝেতে তার ভারী থাবার থপ্ থপ্ আওয়াজ শোনা যেতে লাগলো।

কিছুদূর যাওয়ার পরই কীজুই পেছন থেকে গম্ভীরকণ্ঠে বলে উঠলো—"থামো!"

তারা থেমে পড়লো।

কীজুই তিনবার খুব জোরে মেঝের ওপর কি দিয়ে যেন ঠুকলো। সুন্দর ও রাজীব সবিস্ময়ে দেখলো—তাদের সামনেই একটা পাথরের টুকরো খাড়া হয়ে উঠলো, এবং নীচের দিকে দেখা গেল একটা বড় গর্ত।

কর্কশকণ্ঠে কীজুই আদেশ করলো, "ঐ গর্তে ঢোকো।"

সুন্দর ও রাজীব সেই গর্তের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠলো। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো সেখানে।

তারা ঢুকছে না দেখে কীজুই আবার আদেশ করলো, "ঢোকো শীগ্‌গীর।"

রাজীব জোরে প্রতিবাদ করে উঠলো, "কিছুতেই নয়। এত সহজে তুমি আমাদের মৃত্যুর ফাঁদে ফেলতে পারবে না।"

কীজুই বললো, "ঢুকবে না তোমরা

রাজীব বললো, "না।"

ক্ষিপ্ত হয়ে কীজুই বলে উঠলো, "তবে রে শয়তান!"

কীজুইকে কথাটা শেষ করার সুযোগ দিল না রাজীব। মুহূর্তেই সে ঐ বুড়ো শয়তানের উপর লাফিয়ে পড়লো। রাগে তার চোখে আগুন জ্বলছিল, দাঁতে দাঁত চাপছিল সে।

কীজুইয়ের মুখ থেকে বেরিয়ে এলো আর্ত চিৎকার।

সেজন্যই রাজীব হয়তো এর পর আর কোন সুবিধা করতে পারলো না। চিৎকার শুনে নেকড়েটা তার প্রভুর বিপদ বুঝতে পারলো।

অবিশ্বাস্য দ্রুততায় হিংস্র জন্তুটা ঝাঁপিয়ে পড়লো রাজীবের ওপর। প্রচণ্ড ভারী সামনের পায়ের থাবা দিয়ে রাজীবের দেহটাকে সে জোরে চেপে ধরলো। রাজীবের মনে হলো, এখনি যেন তার দম আটকে যাবে।

কিন্তু আশ্চর্য, নেকড়েটা দাঁত অথবা পায়ের নখগুলো দিয়ে তাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দেবার কোন চেষ্টাই করলো না—যা সে সহজেই করতে পারতো।

সুন্দর চোখের সামনে দেখতে পেল রাজীবের বিপদ। সে তাকে রক্ষা করবার জন্য ছুটে গেলো। কিন্তু পারলো না। মুহূর্তের মধ্যে টর্চের আলোটা নিভে গেলো।

অন্ধকারের অতলে তলিয়ে গেলো চারদিক।

রাজীব তখন চেঁচিয়ে বললো, "সুন্দর, তুমি কোথায়? যেখানে আছো, সেখানেই থাকো। এগিও না, গর্তটাকে চিনে রাখো।"

কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। তাই সুন্দরের জবাবের পরিবর্তে শোনা গেল তার করুণ চিৎকার। ঐ গর্তের নীচে যে অজানা বিপদ ওৎ পেতে আছে, সেখানেই তাকে পড়ে যেতে হলো এক আকস্মিক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে।

রাজীবেরও তখন আর কোন উপায় নেই। কোন দিকেই নেই ছুটে যাবার পথ।

আর একা ছুটে যেয়েই বা করবে কি?

সুন্দরকে অজানা জায়গায় ফেলে চলে যাবে?

আর এদিকে নিজেরও যে ভয়ানক বিপদ।

প্রায় অসুরের মতো শক্তির সাহায্যে লড়াই করে রাজীব জন্তুটার কবল থেকে নিজকে মুক্ত করে নিয়ে সেই গর্তটার দিকেই একটা লাফ মারলো।

সেই সময়েই রাজীবের মনে হলো, এক জোড়া সরু অথচ কঠিন হাত যেন এগিয়ে এলো অন্ধকারের মধ্য থেকে। কার হাত কিছুই সে বুঝতে পারলো না, অথচ তাকে জোরে ঠেলে ফেলে দিলো। সে মেঝেতে পড়ে গেলো এবং ক্রমশঃ নীচু হয়ে যাওয়া মসৃণ পাথরের ঢালু পথ বেয়ে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

এইভাবে গড়িয়ে নীচে পড়তে পড়তে তার মাথা ঘুরে গেলো—মনে হলো তার হৃৎপিণ্ডটা পাথরের মধ্যে ধাক্কা খাচ্ছে। সে প্রায় অচৈতন্য হয়ে পড়লো। তবু বুঝতে পারলো হঠাৎ একটা উঁচু হয়ে ওঠা সিঁড়ির ওপর দিয়ে গড়িয়ে গিয়ে সে এসে পড়লো এক গাদা গাছের ডালপালার এবং ভেড়ার চামড়ার ওপর। উঁচু সিঁড়িটার ওপর দিয়ে গড়িয়ে যাবার সময় মনে হলো তার ঘাড়টা বুঝি ভেঙে গেলো।

নাঃ, এত আঘাত খেয়েও তখনো তার জ্ঞান আছে।

কিন্তু যে জায়গায় এসে পৌঁছেছে, এ জায়গাটা কোথায়? কোন অতল পাতালপুরীতে! এর চারদিকে কি আছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

কাছেই সহসা যেন পাওয়া গেলো কোন জীবন্ত প্রাণের আভাস।

"আরে রাজীব, তুমি?" খুব নিকট থেকেই সুন্দরের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

সুন্দরের কণ্ঠস্বর শুনে এত বিপর্যয়ের মধ্যেও কিছুটা সান্ত্বনা জাগলো রাজীবের মনে। সে বললো, "ভগবানকে ধন্যবাদ, তুমিও এখানে। আমরা খুব বে-কায়দায় পড়ে গেছি, তাই না? আমরা এখন পৃথিবীর কোথায় আছি তা একমাত্র ভগবানই জানেন।"

এমন সময় হঠাৎ ভেসে এলো পৈশাচিক অট্টহাসি। আবার টর্চের আলো অন্ধকারকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিলো।

কি আশ্চর্য গোলকধাঁধা! এখানে কীজুই এলো কি করে?

রাজীব বুঝতে পারলো, সে ঢালু পথ দিয়ে এখানে নামে নি—হয়তো অন্য কোন পথ দিয়ে তাদের ঠিক মাথার উপর কোথাও এসে হাজির হয়েছে।

ভাবতে লাগল রাজীব এখান থেকে বেরোবার কি কোন উপায় আছে? সে উপায় বের করাও তো খুব সহজ নয়। সহসা তার কি একটা কথা মনে হলো। বললো, "সুন্দর, তুমি তো একজন ওস্তাদ স্কাউট। তুমি মাথা ঘামিয়ে দেখো তো, কোন উপায় বের করতে পারো কি না।"

সুন্দরের মাথায় সহসা কোন বুদ্ধি এলো না। তবু মনে যতটা সাহস আছে, তার চেয়েও বেশী সাহস দেখিয়ে বললো—"পারবো, নিশ্চয়ই পারবো। ঢুকবার যখন রাস্তা আছে, বেরোবার রাস্তাও আছে নিশ্চয়ই।"

রাজীব বললো, "যতক্ষণ আমরা এখানে থাকবো, ততক্ষণ আমাদের লড়াই করেই থাকতে হবে। নইলে বুড়ো শয়তানটা আমাদের বাঁচতে দেবে না।

কীজুই বলে উঠলো, "সাবধান, তোমরা লড়াই করবার চেষ্টা করো না। তা হলে নির্ঘাৎ তোমাদের মৃত্যু ঘটবে। আমি এখন যা নির্দেশ করছি, সেই নির্দেশ মেনে চলো।"

ক্ষুব্ধকণ্ঠে রাজীব জিগ্যেস করলো, "কি নির্দেশ?"

কীজুই বললো, "সামনে যে সুড়ঙ্গ দেখছো, ঐ সুড়ঙ্গ দিয়ে একজন একজন করে নেমে যাও। তাড়াতাড়ি চলো। চালাকি করো না। আমি তোমাদের পেছনে পেছনে যাচ্ছি।"

রাজীব ও সুন্দর চারদিকে তাকিয়ে কোন সুড়ঙ্গ দেখতে পেলো না। তারা ছোট্ট ঘরটার মধ্যে কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইলো। অন্ধকারে এবং অপ্রশস্ত জায়গায় দাঁড়িয়ে তাদের দম যেন বন্ধ হবার উপক্রম হলো।

সহসা আবার ফুটে উঠলো আলো। কীজুই সেই অপ্রশস্ত ঘরটার দেওয়ালে তার টর্চের আলো ফেললো। সেই আলোকে তারা দেখতে পেলো দেওয়ালের মাঝখানে একটা গহ্বর। (চলবে)

গিলগামেশের গল্প

পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

[পৃথিবীর ইতিহাসে যত প্রাচীন কাহিনী গড়ে উঠেছে, তাদের মধ্যে গিলগামেশ একটি মহাকাব্য। প্রাচীন ব্যাবিলন রাজ্যে এই কাহিনীটি পাওয়া গেছে, অসুরবানি পালের রাজধানী নিনেভের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে। বারোটি পোড়ামাটির ফলকে এই মহাকাব্যটি রচিত হয়েছে। গল্পটির বয়স খুব কম ক'রে হ'লেও প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর—মূল কাহিনীটির উৎপত্তি আরো অনেক আগে হওয়াই সম্ভব। কাহিনীগুলোতে মানবসৃষ্টির ইতিহাস এবং জীবন-মৃত্যুর রহস্য ভেদ করা হ'য়েছে। বাইবেলের কাহিনীর সঙ্গে মেলে, এমন অনেক কাহিনীও এতে স্থান পেয়েছে। বাইবেলে যে মহাপ্লাবনের গল্প আছে, তেমন একটা গল্প আছে গিলগামেশ মহাকাব্যেও। নোয়ার পরিবর্তে এখানে আছেন উতনপিশ্‌তিম্—যিনি পৃথিবীর যাবতীয় জীবজন্তুর পূর্বপুরুষকেই যে শুধু বাঁচিয়েছিলেন, তাই নয়; তিনি নিজেও চিরযুবা হ'য়ে অমরত্ব লাভ করেছিলেন।]

সেকালে এক রাজ্য ছিল, নাম এরেক (Erech)। রাজ্যের রাজার নাম গিলগামেশ। এক সময় এরেক রাজ্যে নানা বিপদ-আপদ দেখা দিলে রাজ্যবাসী সকলে মিলে এই বিপদের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্যে দেবী অরুরুর শরণাপন্ন হ'লো। তারা দেবীর কাছে এক কাতর প্রার্থনা জানালো, যাতে দেবী তাদের জন্যে এক ত্রাণকর্তার সৃষ্টি করেন, যিনি রাজ্যের প্রজাদের সকল দুর্দৈবের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন। সমবেত কাতর প্রার্থনায় দেবীর মন বিগলিত হ'লো। তিনি মাটি দিয়ে তৈরি করলেন এক মহাবীর – নাম হ'লো তার ইয়াবানী (Eabani)। আকৃতি এবং প্রকৃতি—উভয়দিক থেকেই ইয়াবানী ছিল বন্যজন্তুর মতোই ভীষণ-দর্শন এবং হিংস্র। এর কথা শুনতে পেয়ে রাজা এক শিকারীকে পাঠালেন ইয়াবানীর সন্ধানে। শিকারী খুঁজতে খুঁজতে ইয়াবানীর সন্ধান পেলো এক জলার ধারে। কিন্তু শিকারী জানতো, তার সাধ্য নেই যে, ইয়াবানীকে কাবু করতে পারে। তাই সে ছলনার সাহায্যে ইয়াবানীকে রাজ্যের ভিতরে নিয়ে আসবার উদ্দেশ্যে পাঠালো এক পরমাসুন্দরী নারীকে। নারী তার ছলনায় মুগ্ধ করে ইয়াবানীকে আনলো এরেক রাজ্যের ভিতরে—যেখানে গিলগামেশ রাজত্ব করেন। গিলগামেশ আর ইয়াবানী—দু'জনেই মহাবীর পুরুষ, দ্বন্দ্বযুদ্ধে কে কাকে হারাবেন, ঠিক নেই। যিনিই পরাভূত হবেন, তাতেই রাজ্যের শক্তিক্ষয় হ'বে—এই বিবেচনায় সূর্যদেবতা সামাস দু'জনের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হ'তে দিলেন না। ফলে গিলগামেশ আর ইয়াবানীর মধ্যে সৌহার্দ্যের বন্ধন গড়ে উঠ্‌লো এবং এঁদের সমবেত প্রচেষ্টায় এরেকের প্রধান শত্রু ইলামের রাজা সাম্বা যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হলেন।

এরেক রাজ্যে ছিলো দেবী ইস্তারের মন্দির। ইস্তার সুপুরুষ দেখলেই তাকে বিয়ে করতে চাইতেন। রূপের প্রতি ছিল তার ভীষণ মোহ, কিন্তু আচরণের দিক থেকে তিনি ছিলেন ভীষণ নিষ্ঠুর। তাঁর এক-কালের প্রিয়পাত্ররা যে পরবর্তিকালে কী নির্যাতন ভোগ করেছেন, তা তখন অনেকেই জানতো। এই দেবী ইস্তার যখন কন্দর্পতুল্য সুপুরুষ গিলগামেশকে সর্বপ্রকার সুখ-শান্তি ও ঐশ্বর্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিয়ে করতে চাইলেন তখন পরিণামের কথা ভেবে গিলগামেশ বিনীতভাবে দেবী ইস্তারের প্রস্তাব এড়িয়ে গেলেন। অপমানিত ও ক্রুদ্ধ হ'য়ে ইস্তার গিলগামেশের অনিষ্ট চিন্তায় পিতা আনুর শরণাপন্ন হ'লেন। মানুষের স্পর্ধার উপযুক্ত জবাব দেবার জন্যে ইস্তার আনুকে অনুরোধ জানালেন, আনু যেন এমন এক ষণ্ডাসুরের সৃষ্টি ক'রে দেন, যার হাতে গিল-গামেশের মৃত্যু ঘট্‌তে পারে। নিরীহ গিলগামেশের প্রতি আনুর কোন বিদ্বেষভাব না থাকলেও কন্যাকে খুশি করবার জন্যে পিতা আনু এক ভয়ালদর্শন ষণ্ডাসুর সৃষ্টি করলেন। এ কাহিনীর বিবরণ

পেঁছালো গিলগামেশের কানে। তিনি বন্ধু ইয়াবানীকে নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করলেন ষণ্ডাসুরের বিরুদ্ধে। যুদ্ধে ষণ্ডাসুর পরাজিত ও নিহত হ'লে ক্রুদ্ধা ইস্তারের অভিশাপে কিয়ৎকাল পর ইয়াবানীরও মৃত্যু হ'লো। শুধু তাই নয়। স্বপ্নে দেখা দিয়ে ইস্তার গিলগামেশকে এমন অভিশাপ দিলেন যাতে ঘুম ভাঙ্গার পরই গিলগামেশ-এর সৌম্য সুদর্শন রূপ অন্তর্হিত হ'লো এবং তিনি এক কুৎসিত কদাকার পুরুষে রূপান্তরিত হ'লেন।

এর পর আর গিলগামেশের পক্ষে রাজ্যে থাকা সম্ভবপর হ'লো না। ক্ষুব্ধ হৃদয়ে তিনি চললেন নির্জন বনবাসে। তিনি সারাক্ষণ শুধু পথ চলেন আর ভাবেন, কী ক'রে তিনি তাঁর পূর্ব দেহকান্তি ফিরে পেতে পারেন। ভাবতে ভাবতে চলতে চলতে তিনি দেখতে পেলেন, সামনেই মাশী বা অস্তাচলে যাবার অন্ধকার পথ শুরু হ'য়েছে, আর সেখানে দাঁড়িয়ে আছে পাহারাদার—দুই বৃশ্চিকমানব। সেই বিকট পাহারাদারদের দেখে গিলগামেশ ভয়ে আৎকে উঠলেও পরমুহূর্তেই বুঝলেন যে, ওরা কোন অনিষ্ট করবে না বরং ওদের দৃষ্টিতে সহানুভূতিরই পরিচয় রয়েছে। তখন ভরসা ক'রে গিলগামেশ ওদের কাছে জানতে চাইলেন, কোন্ পথে গেলে তিনি তার পূর্বপুরুষ অমর উতন-পিশ্তিমের কাছে পেঁছুতে পারবেন।

বৃশ্চিকমানবদের কাছ থেকে পথের নির্দেশ পেয়ে গিলগামেশ অন্ধকার মাশীপর্বত পার হ'বার জন্য আবার যাত্রা শুরু করলেন। সেই অন্ধকারের মধ্যেই একটি আলোকরেখার সন্ধান পেয়ে একসময় তিনি অস্তাচল পার হ'য়ে সমুদ্রতীরবর্তী এক সুন্দর বনভূমি দেখতে পেলেন। এবার তাঁকে এই সমুদ্র পার হ'তে হ'বে—তাই তিনি সমুদ্রদেবী সবিতুকে স্তব-স্তুতি দ্বারা সন্তুষ্ট ক'রে সমুদ্রপার হ'বার সহায়তা চাইলেন। সাধু সমাসের মাঝি আরাদ্রা এক নৌকো নিয়ে এলেন দেবীর ইঙ্গিতে—তারপর গিলগামেশ সেই নৌকোয় চড়ে বসলেন। চল্লিশটি দিনরাত নিরবচ্ছিন্নভাবে নৌকো চালিয়ে তাঁরা দু'জন পার হ'লেন সেই মৃত্যুসমুদ্র— এবার গিলগামেশ এসে পেঁছুলেন তার চিরপ্রার্থিত শান্তিদ্বীপে, যেখানে বাস করছেন তাঁর পূর্বপুরুষ উতনপিশ্তিম্।

নিজেদের বংশধরকে মৃত্যুসমুদ্র পার হ'য়ে সশরীরে শান্তিদ্বীপে উপস্থিত হ'তে দেখে খুশি হলেন উত-নপিশ্তিম্। গিল্গামেশ খুব আদরযত্ন পেলেন, শুনলেন পূর্বপুরুষদের অনেক কাহিনী, শুনলেন সেই মহাপ্লাবনেরও বিবরণ। তাঁর মনোগত ভাব জানতে পেরে পিতৃপুরুষ উত-নপিশ্তিম্ তাঁকে এমন খাদ্য দিলেন, যা খেয়ে গিল্গামেশ ছ' দিন ছ' রাত এক নাগাড়ে ঘুমিয়ে কাটালেন। তারপর যখন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন গিলগামেশ, তখনই তিনি অনুভব করলেন যেন তাঁর দেহে ফিরে এসেছে অযুত হস্তীর বল। এবার তিনি স্নান করলেন সৌন্দর্যপ্রপাতে— ফিরে পেলেন তার পূর্বরূপ। মনের আনন্দে উত-নপিশ্তিমকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি ফিরে এলেন স্বীয় রাজ্য এরেকে। স্তবস্তুতি, পূজার্চনা দ্বারা তিনি দেবী ইস্তারের ক্রোধ শান্ত করলেন। প্রজারা খুব খুশি। গিল্গামেশ দীর্ঘকাল রাজত্ব করলেন।

গুপ্তচরের স্বদেশপ্রীতি

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় লেফটেনাণ্ট কার্ল লোডী নামে একজন জার্মান স্পাই ইংলণ্ডে ছিল। নিখুঁত ছিল তার ছদ্মবেশ। তবু ধরা পড়লো। অনেক অত্যাচার করা হলো তার ওপর। তবু সে স্বীকারোক্তি করলো না। কোর্টমার্শেলে নিজের ফাঁসীর হুকুম শুনে সে জবানবন্দীতে বললো, আমি যা করেছি তার জন্য আপনাদের এতটুকু করুণা ভিক্ষা করতে চাই না। আমি যা করেছি তার জন্য একটুও অনুতপ্ত নই। দেশকে আমি ভালবাসি। দেশের জন্যই আমি এ কাজে ব্রতী হয়েছি। অনেক ইংরেজও জার্মানদেশে এই কাজ করছে, আমি জানি।

কার্ল লোডীর এই কথা শুনে মনে হয়, গুপ্তচরদের অন্তরে স্বদেশপ্রীতিও কম থাকে না। অবশ্য একথা সত্য, তাদের সেই স্বদেশপ্রীতির কোন ঐতিহাসিক মূল্য দেওয়া হয় না।

কে বড় ?

লক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য

সে অনেকদিন আগের কথা। এই ভারতবর্ষেরই এক বিখ্যাত শহরে এক গুণী শিল্পী বাস করতেন। তাঁর কাছে দেশ-বিদেশ থেকে ছাত্ররা আসতো ছবি আঁকা শিখতে। চিত্রকর তাদের মনের মতো করে হাতে ধরে নানা শিক্ষা দিতেন, বস্তুকে দেখবার চোখ খুলে দিতেন আর নিজে যতদিন পর্যন্ত তৃপ্ত না হন তাদের ছাড়তেন না।

একবারের কথা বলি। **সমগ্র ছাত্রবৃন্দের** মধ্য থেকে তিনটি ছাত্র গুরুদেবের মন হরণ করেছেন। তিনজনই ছিল জহুরে আঁকিয়ে। যেমন দ্রুত তারা আঁকতো, তেমনি নিখুঁত ছিল তাদের কাজ। গুরুদেব স্বয়ং তাদের শিক্ষক, তবুও ছাত্র তিনটির শ্রেষ্ঠত্ব বিচারে তিনি ব্যর্থ হচ্ছিলেন।

একদিন তিনি তাদের তিনজনকেই আহবান করলেন। তখন ব্রাহ্মমুহূর্ত, সূর্যদেবকে সাক্ষী রেখে গুরুদেব তাদের আশীর্বচন শোনালেন। পরে মধুরবচনে বললেন, তোমাদের প্রত্যেককে তিনদিন সময় দিলাম। জীবনের শ্রেষ্ঠ চিত্রটি আঁক ; যার আঁকা শ্রেষ্ঠ হবে, তাকে আমি 'শিল্পীশ্রেষ্ঠ' বলে ঘোষণা করবো ; সেই হবে আমার উত্তরাধিকারী – তার হাতে সব কিছু তুলে দিয়ে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করবো আমি।'

বিরাট দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে ছাত্র-শিল্পী তিনজন গুরু-দেবকে প্রণাম করে নিজের নিজের ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলো। তারপর…তারপর দুপুর হয়, বিকেল এগিয়ে আসে, সন্ধ্যে…রাত্তির…সময় এগিয়ে চলে। **সময় পরাস্ত** হয় বুঝি ওদের একাগ্রতার কাছে, কিংবা ওদের এক-নিষ্ঠতাকে মূল্য দেবার জন্য সময় বুঝি তিনদিনের জন্য থেমে থাকে।

তিনদিন কাটে। চতুর্থ দিন ভোরের আলো আকাশ রাঙিয়ে তোলবার সঙ্গে সঙ্গে, ছাত্র-শিল্পী তিন-জন ঐ রঙটুকু মুখে মেখে গুরুদেবের দরজায় উপস্থিত হয়।

গুরুদেব প্রস্তুত ছিলেন। তিনি তাদের ডাকে বেরিয়ে এলেন…চললেন সেখানে, যেখানে ওদের শ্রেষ্ঠ কীর্তি সাজানো রয়েছে মূল্য প্রাপ্তির আশায়।

প্রথম ছাত্রটির ঘরের কাছাকাছি আসতেই গুরুদেবের চোখে পড়লো একটি বিরাট ক্যানভাস। তাতে আঁকা একটি গোলাপ ফুলের গাছ ; থরে বিথরে লাল, রক্তিম লাল গোলাপে ভর্তি তা'।

গুরুদেব খুশী হলেন। নিরীক্ষণ করবার জন্য তিনি ছবিটির দিকে এগোতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ শ্লথগতি হয়ে পড়লেন। তাঁকে বিস্ময়ে অভিভূত করে একদল রঙিন প্রজাপতি তাদের পাখায় বীণা

প্রজাপতি গোলাপ ফুলের উপর বসতে চেষ্টা করলো

বাজাতে বাজাতে উড়ে এসে মধু খাবার লোভে ঐ গোলাপফুলগুলোর ওপর বসবার চেষ্টা করতে লাগলো !

দ্বিতীয় ছাত্রটি শিল্পী-গুরুর সঙ্গেই ছিলো। সে তাঁকে নিয়ে চললো নিজের সৃষ্টি দেখাবার জন্য। দূর থেকেই গুরুদেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো বিরাট একটি ফলের গাছ, যা কিনা আরো বিরাট একটি ক্যানভাসে ধরা রয়েছে। 'সত্যিই অপূর্ব, যেন

চারপাশের আর পাঁচটা ফলের গাছের সঙ্গে মিশে গেছে এই আঁকা-গাছের ছবিটি' ঃ গুরুদেব ভাবলেন। ছাত্রটি তাঁকে বললো ঃ 'ঐ দেখুন, পাখির দল কেমন বার বার উড়ে এসে ফলগুলোকে ঠোকরাচ্ছে'। সত্যি, গুরুদেব তাই দেখলেন। এবারও স্পষ্টতঃ তাঁর ভালো লাগলো।

পাখির দল ফল ঠোকরাচ্ছে

এবার? এবার তৃতীয় ছাত্রটির আঁকা দেখেই গুরুদেবকে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে, কোন ছবিটি শ্রেষ্ঠ? কিন্তু কোথায়—কোথায় সে? এতক্ষণ তিনি তাকে লক্ষ্যই করেন নি। আশেপাশে কোথাও ওকে দেখতে না পেয়ে গুরু-শিল্পী তৃতীয় ছাত্রটির ঘরের দিকে এগিয়ে চললেন। পৌঁছলেন সেই ঘরে।

দরজার মুখেই ছাত্রটি দাঁড়িয়ে ছিল। বিষণ্ণ, ক্লান্ত মুখমণ্ডল। রাত্রি জাগরণের ছাপ চোখে মুখে। বিস্রস্ত বেশ-বাস। গুরুদেব এগিয়ে এলেন তাঁর দিকে ঃ

তোমার ছবি কই? এখনো বুঝি সমাপ্ত হয় নি তোমার সৃষ্টি?

হয়েছে, গুরুদেব। বিনত ভঙ্গিতে উত্তর দিলো তৃতীয় ছাত্র।

কই, পথে তো তোমার চিত্র চোখে পড়লো না?

আসুন, গুরুদেব, ঘরে আসুন।

গুরুদেবকে এগিয়ে দিয়ে মাথা নীচু করে পিছু পিছু প্রবেশ করলো সে।

ঘরে ঢুকে এদিক ওদিক চেয়ে, সব কিছু নিরীক্ষণ করেও এই ছাত্রটির আঁকা-ছবি গুরুদেবের চোখে পড়লো না। তিনি স্বভাবতই বিরক্তি বোধ করলেন। 'আশ্চর্য, ঘর তো শূন্য, কোথায় তোমার ছবি'—বলতে বলতে গুরুদেব ঘরের আর একটু ভেতরে প্রবেশ করলেন। দূরে দেখলেন, একটি পর্দা। ভাবলেন, পর্দার আড়ালেই বোধ করি আঁকা রয়েছে তাঁর তৃতীয় ছাত্রের অঙ্কিত ছবিটি। ওকে আর কিছু জিগ্যেস না করে পর্দাটির দিকে দ্রুত এগিয়ে গেলেন তিনি। তারপর বাঁ হাতে পর্দাটা কিছুটা তুলে ওপাশে যেতে চাইলেন তিনি। কিন্তু···

পর্দার কিছুটা অংশও তুলতে পারলেন না

কিন্তু, এ কী হলো! গুরুদেব তো পর্দার কিছুটা অংশও তুলতে পারলেন না, পর্দার নরম কাপড়ের স্পর্শও তিনি পেলেন না। তিনি লজ্জিত হলেন। তাঁর ছাত্র তো তাঁকে খুব ঠকিয়েছে। ছবির ভালো-মন্দ বিচার করতে এসে তিনি আঁকা পর্দাকে সত্যি পর্দা বলে ভুল করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রের অভূতপূর্ব কৃতিত্বে তাঁর হৃদয়-মন খুশীতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

গভীরভাবে বুকের নিভৃতে এনে জড়িয়ে ধরলেন গুরুদেব, তাঁর তৃতীয় ছাত্রকে। বললেন, 'ওরা ভুলিয়েছে প্রজাপতিকে,···পাখিদের; আর তুমি? তুমি ভুলিয়েছ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান জীব মানুষকে। তুমিই হবে আমার যোগ্য উত্তরাধিকারী। সার্থক স্রষ্টা তুমি! শ্রেষ্ঠ তোমার সৃষ্টি!'

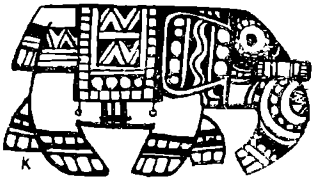

গণেশ বাবাজী

সুলতা রায়

জলপাইগুড়ি জেলায় জয়ন্তী নামে ছোট্ট একটি পাহাড়ী গ্রামের নাম হয়ত তোমরা অনেকেই জান না। আজ সেখানকার একটা সুন্দর ঘটনার গল্প তোমাদের কাছে বলব।

১৯৬৪ কি '৬৫ সাল হবে ঠিক মনে পড়ছে না—কিন্তু ঘটনাটা আজও স্পষ্ট মনে আছে। সে সময় হাতী, বাঘ, হরিণ, বানর ইত্যাদিতে ওখানকার জঙ্গল ভর্তি ছিল।

কয়েক বিঘা জমির উপর কাঠের দোতলা বাংলো বাড়ি দুটো ছিল। একটিতে আমরা থাকতাম, অন্যটি ছিল অতিথিশালা। আমাদের বাড়ির পিছনেই শাল-গাছের গভীর জঙ্গল। বাড়ির সামনে ফুলের বাগান, আর পিছনে জঙ্গলের গায়েই ফল ও সবজির বাগান। চারিদিক খোলা, কেবল কাঁটাতারের বেড়া। সুতরাং জীবজানোয়ারের চলাফেরা খুবই সহজ ব্যাপার। কলা-গাছও ছিল বাগানে প্রচুর। প্রায়ই হাতী বেরোত। সন্ধ্যে নেমে এলেই আর কথা নেই, সকলেই সাবধানে চলাফেরা করত। বিশেষ প্রয়োজন না হলে কেউ বাড়ির বাইরে যেত না। বর্ষাকালে ছিল বেশী ভয়। দিন দুপুরেই যেখানে সেখানে হাতীর দেখা মিলত।

একদিন রাত ৯টা হবে, রাতের খাওয়া সেরে সবাই উপরের তলায় উঠেছি, কারণ রান্নাখাওয়া হতো নিচের ঘরে। রুদলা নামে আমাদের একটা বিহারী চাকর ছিল। হঠাৎ দৌড়ে উপরে এসে সে ডাকল—"মাইজী হাতী হ্যায়, হাতী হ্যায়।" তাকিয়ে দেখি বেচারা ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। তাড়াতাড়ি ছেলেমেয়েদের নিয়ে বড় টর্চটা হাতে করে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। দেখি বাগানের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে মস্ত এক হাতী। মুখের একপাশে একহাত লম্বা সাদা দাঁত। অন্যদিকে ভাঙ্গা আধখানা দাঁত। কী যেন ভাবছে। অনেকক্ষণ ওইভাবে আছে দেখে আমার স্বামী বন্দুক এনে একটা গুলি করলেন। কিছুই হ'ল না। যেমন ছিল তেমনি। তাই আবার একটা গুলি করলেন গায়ে। যেই না গুলিটা লাগল, এমন একটা বিকট চিৎকার করে ভীষণ লাফ দিয়ে ছুটল জঙ্গলের দিকে। মনে হ'ল যেন মাটিটা ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে গেল, আর টের পাচ্ছি জঙ্গলের মধ্যে গাছগুলো ভেঙ্গে দুমড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে।

যাই হোক্—আমরা তো ভয়ে ভয়েই শুয়ে পড়লাম। প্রায় দুই ঘণ্টা বাদে আবার সে বাগানে ঢুকে মনের আনন্দে কলাগাছগুলোর সদ্গতি করতে লাগল। শব্দ পেয়ে আবার আমরা উঠে আসি। তার বসার ভঙ্গি দেখে এবার আর তাকে তাড়াবার কথা মনেই হল না।

দেখি, সামনের পা দু'টো ভেঙ্গে হাঁটু গেড়ে ঠিক যেন গণেশ ঠাকুরটি হ'য়ে বসে কলাগাছের মাথাটা ছিঁড়ে ফেলছে, আর ভেতরে শুঁড় ঢুকিয়ে সাদা থোড়টাকে বার করে নিয়ে আরামসে খাচ্ছে। এ দৃশ্য না দেখলে বোঝা কঠিন। অবশ্য, সেদিন আমাদের কলাবাগান প্রায় নিঃশেষ করে তবে সে প্রস্থান করেছিল। তবু আজও চোখ বুজলে ওর ওই গণেশঠাকুরটি হয়ে বসে থাকা ভঙ্গীটি দেখতে পাই।

———

রুমকীর জন্মদিনে

মীরা বালসুব্রহ্মনিয়াম

সন্ধ্যে সাতটা তখন। রুমকী ইতিহাসটা মুখস্থ করার প্রাণপণ চেষ্টা করছিল—কারণ কালই একটা টেস্ট রয়েছে।

রুমকীর মা এসে ওর পড়ার টেবিলের সামনে দাঁড়ালো। সাধারণতঃ মা এ সময়টা রুমকীর কাছে আসে না। নিজের স্কুলের ক্লাস টেস্ট বা পরীক্ষার খাতা দেখে। কিন্তু আজ মা এসে শুধু দাঁড়ালোই না—হাতটা আলতোভাবে রুমকীর পিঠে রেখে বললো—"রুমকী, এবার তুমি জন্মদিনে কী নেবে?"

মার কথায় ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকালো রুমকী। আরে, পর্শু দিনই তো ওর জন্মদিন। খেয়ালই হয় নি ওর। কিন্তু কী নেওয়া যায়?

রুমকীর বাবা মারা গেছেন বছর পাঁচেক আগে। রুমকীর তখন সাত বছর বয়স। পর্শু দিন ওর বারো পূর্ণ হবে।

ওর আর ভাই বোন নেই। রমকীর মা একটা স্কুলে কাজ করেন। ছোট্ট দু'ঘরের বাড়ি ওদের। সাধারণ সংসার। টেনেটুনে চলে।

প্রতি বছর জন্মদিনে রুকমী একটা কিছু উপহার পায়। ওর মা আগে থাকতে ভেবেচিন্তে একটা কিছু কেনে যেটা ওর দরকার। প্রায়ই কেনা হয় জামা, জুতো। কাকা-পিসীরাও মাঝে মাঝে ওকে জন্মদিনের উপহার দেয়—কিন্তু দেয় কাজের জিনিস। ওয়াটার-বটল,—স্কুলের ব্যাগ, বল-পয়েন্ট পেনের সেট।

কিন্তু রুমকীর বন্ধুদের জন্মদিন হয় অন্য রকমের। ওর বন্ধু এলার জন্মদিনের পার্টিতে একবার গিয়েছিল রুমকী। কাগজের শেকল, চীনে লণ্ঠন আর বেলুন দিয়ে সাজানো ঘরটা। দরজার সামনে আবার আলপনা। টেবিলের ওপর ফ্লুরির বিরাট কেক,—লেখা,—'হ্যাপী বার্থডে, এলা।" রুমকীর এখনো মনে আছে, কয়েকটা ঘণ্টা কী আনন্দেই যে কেটেছিল। গলা ছেড়ে সবাই গেয়েছিল—'হ্যাপী বার্থ-ডে টু ইউ এলা, হ্যাপী লং লাইফ টু ইউ—"

আবার অঞ্জনার জন্মদিন হয়ছিল একদম অন্যরকম। বেলুন টেলুন কিছু না,—কেকও না। তবে অঞ্জনার বাড়িতে দুপুরে খাওয়ার নেমন্তন্ন ছিল ওর বন্ধুদের। খাওয়া দাওয়ার পর দু' গাড়ি বোঝাই করে সব বন্ধুদের নিয়ে সিনেমা দেখতে গিয়েছিল অঞ্জনা। ইন্টারভ্যালে বেরিয়ে সবাই খেল কোয়ালিটির আইসক্রীম।

"কিছু বলছো না যে রুমকী?" মা জিগ্যেস করে। "কী নেবে তুমি?"

"মা," একটু লাজুক গলায় বলে রুমকী—"এবার আমার জন্মদিনে একটা পার্টি করবে? কয়েকজন বন্ধুকে ডাকবো?"

"পার্টি?" মা ভুরু কোঁচকায়। "অনেক খরচ তাতে। অত খরচ করার পয়সা কোথায়?"

"তা হলে বন্ধুদের নিয়ে সেদিন একটা সিনেমা দেখে আসি?"

"না বাপু, অত সখে কাজ নেই। সিনেমায় যেতে চাও—আমার সঙ্গে যাবে। দশ বারোজনের সিনেমার খরচ কম নয়। অত পয়সা নষ্ট করতে নেই রুমকী। কাজের জিনিস করো, ম্যাক্সি চাইছিলে—না হয় একটা ম্যাক্সি নাও।"

"যা তোমার খুশী দিয়ো --" বলে উঠে চলে যায় রুমকী। মা যদি মনে মনে ঠিকই করে থাকে কী কিনবে—তবে আর ওকে জিগ্যেস করা কেন? হঠাৎ ওর চোখে জল এসে যায়। আশ্চর্য, মা কী ওকে কোনদিন নিজের ইচ্ছেমত কিছুই করতে দেবে না,—কিনতে দেবে না? কাজের জিনিস,- শুধু কাজের জিনিস কেন কিনবে রুমকী? বই গোছাবার ছল করে চোখের জল সামলায় ও।

অবশ্য ম্যাক্সি কেনারও ইচ্ছে আছে ওর। আজকাল যা সুন্দর সুন্দর ম্যাক্সি বেরিয়েছে। পথেঘাটে রুমকীর বয়েসী মেয়েদের পরনে নানা ডিজাইনের ম্যাক্সি —দেখতে কী ভালো যে লাগে! রুমকী কী কোনদিন ওদের মতো হতে পারবে?

মা বলে—"কাল বিকেলে বেরুবো আমরা ম্যাক্সি কিনতে,—কেমন? কাল তো শনিবার।"

কিন্তু পরদিন স্কুল থেকে ফিরে রুমকী দেখে কাকা-পিসীরা সব্বাই এসেছে। শনিবারের বিকেলবেলা প্রায়ই আসে ওরা। অতএব আর বেরুনো হয় না। চা করার ফাঁকে রুমকীকে ডেকে নিয়ে মা বলে—"না হয় কাল যাবো আমরা। গড়িয়াহাটের হকারের দোকানগুলো তো রোববারও খোলা থাকে।"

কিন্তু রুমকীর ভাগ্যে বোধ হয় ম্যাক্সি কেনা ছিল না। তাই পরদিন মার ঘুম ভাঙে জ্বর নিয়ে। রোববার তাই স্কুল কামাই হবে না মার। কিন্তু শনিবারও একগাদা খাতা নিয়ে এসেছে মা। সেদিকে তাকিয়ে মা আপসোসের সুরে বলে—"আঃ, দিনটা মাটি হোল। মাথাটা যা ধরেছে না—"

"একটা অ্যাসপ্রো দেবো, মা?"

"দাও। আর শোনো, টাকা দিচ্ছি—তোমার বন্ধু বুলবুলিকে নিয়ে গিয়ে একটা ম্যাক্সি কিনে আনতে পারবে না?"

মা কী সত্যি সত্যি ওকে ম্যাক্সি কিনতে পাঠাচ্ছে নাকি? রুমকীর মনটা আনন্দে লাফিয়ে উঠলো। মার অসুখে আনন্দিত হওয়া উচিত নয় জেনেও।

"খুব পারবো মা। তুমি ভেবো না।"

"তোমার দুপুরের খাবার—"

"সরলাকে বলো ষ্টোভটা ধরিয়ে দিতে। সেদ্ধ ভাত করে নিতে পারবো। আমি এখন বড় হয়েছি মা।"

"তোমার আজ জন্মদিন, আর তুমি সেদ্ধ ভাত খাবে?"

"তাতে কী মা? পরে একদিন পায়েস করে দিও।" বলে হালকা পায়ে প্রায় ছুটে চলে এলো রুমকী।

আসলে রুমকী ভাবছিল ম্যাক্সি-ট্যাক্সি কিছু কিনবে না—বুলবুলিকে সঙ্গে নিয়ে ট্রামে চড়ে এসপ্ল্যানেড যাবে—নয়তো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। দামী আইস্ক্রীম খাবে,—খাবে ফুচকা। তারপর প্ল্যানেটেরিয়ামে একটা 'শো' দেখে বাড়ি ফিরবে।—তারপর? তারপর মার কাছে এসে কাঁচুমাচু মুখে বলবে টাকাটা যে কোথায় পড়ে গেল। ম্যাক্সি কেনা হলো না। "মা রাগ করবে সত্যি, কিন্তু খুব বেশী নয় কারণ জন্মদিনে রুমকীর জন্য কিছু কেনা হলো না এটা ভেবেই মার মনটা খারাপ হয়ে থাকবে। মাকে অবশ্য ঠকানো হবে এতে। কথাটা মনে খচখচ করছিল—কিন্তু নিজের ইচ্ছেমত জন্মদিনটা কাটাবার লোভও সামলাতে পারছিল না রুমকী।

তিনটে বাজার একটু আগেই জামা পাল্টে চুল বেঁধে, মুখে পাউডার মেখে তৈরি হয়ে নিল রুমকী। খাটের তলায় রাখা ওর সুটকেশ থেকে কটক থেকে আনা ভেলভেটের বটুয়াটা বার করলো। খুলে দেখলো কিছু খুচরা পয়সা আছে ওতে। মার কাছে এসে বললো—'টাকা দেবে মা?"

বালিশের তলা থেকে ছোট মনিব্যাগটা বার করলো মা। তারপর দুটো দশ টাকার নোট বার করে রুমকীর হাতে দিয়ে বললো—"এতে হবে তো?"

"হয়ে যাবে মা—।"

রুমকীর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে মা। তারপর বলে—"সুন্দর দেখাচ্ছে তোকে। কিন্তু কপালে টিপ দিস নি কেন?"

"দিচ্ছি মা—।"

কপালে টিপ দিয়ে—গায়ে একটু ওডিকোলোন ছড়িয়ে বটুয়া দোলাতে দোলাতে রুমকী বললো—"তা হলে যাই মা—"

"এসো।"

বুলবুলির বাড়ি কাছেই। বন্ধুর কাছে প্ল্যানটা শুনে ও বললো—"বুদ্ধিটা মন্দ করিস নি। কিন্তু ম্যাক্সি না কিনতে পারলে মন খারাপ হবে না তো?'

"একটু হবে। কিন্তু কী আর করা যাবে—"

দু'বন্ধুতে গল্প করতে করতে ট্রাম রাস্তার দিকে রওনা হলো। গড়িয়াহাটের ট্রাম ধরবে না ওরা। উল্টো দিকের ট্রাম স্টপেজে এসে দাঁড়ালো দু'জনে। রুমকীর বুকটা ধুক্ ধুক্ করছে। এর আগে মা বা অন্য কোন আত্মীয়ের সঙ্গে ছাড়া কোথাও যায় নি রুমকী। বুলবুলির অবশ্য একা চলাফেরা করে অভ্যেস আছে।

ট্রাম স্টপেজের কাছে ফুচকাওয়ালা দাঁড়িয়েছিল একটা। বুলবুলি বললো—"আয় ফুচকা খাই।"

"এখনই—" ?

আর্তনাদ করে বলে উঠলো—আমার টাকা

"বা রে, এনজয় করতে বেরিয়েছিস না ?"

অতএব দু'বন্ধুতে ফুচকা খেল খান কয়েক। ঝাল ঝাল আলু আর টকটক জিরা পানিটা চমৎকার লাগলো। আজ কী রুমকীর জন্মদিন বলেই সব কিছুই ভালো লাগছে ?

ট্রাম এলো। বেশ ভিড়। কিন্তু কুছ পরোয়া নেই ভাব নিয়ে বুলবুলি ভিড় ঠেলে উঠে পড়লো—পেছন পেছন রুমকীও। তারপর আরেকটু ঠেলে এগিয়ে এসে লেডিস্‌সিটও পেয়ে গেল দু'জনে। আরাম করে বসে গল্প করতে লাগলো ওরা। খানিক পর রুমকী বললো, "ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েলের টিকিট কিনবো তো ?"

"না। এসপ্ল্যানেডের টিকিট কেন। ময়দানে বেড়াবো—না হয় যাবো নিউ মার্কেটে। গেছিস কখনো আগে ?"

"মার সঙ্গে গেছি।"

একটু পরে কণ্ডাক্টর এসে টিকিটের জন্য হাত বাড়ালো। বটুয়াটা খুলে পয়সা দিতে গিয়ে রুমকীর মুখটা সাদা হয়ে গেল—। প্রায় আর্তনাদ করে বলে উঠলো—"আমার টাকা ?"

"কী হলো তোর টাকার ?"

"আমার টাকা তো বটুয়ায় নেই ? কী হলো ? নীচে পড়েছে কি ?"

উঠে সিটের নীচে আশপাশে খোঁজে রুমকী। নাঃ, কোথাও নেই সেই কড়কড়ে দশ টাকার দুটো নোট। তবে কি সেই ফুচকাওয়ালাকে পয়সা দিতে গিয়েই রাস্তায় পড়ে গেল ?

কণ্ডাক্টর তাড়া দিয়ে বললে—"তাড়াতাড়ি পয়সা দিয়ে দিন—কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবো—"

খুচরো পয়সাগুলো গুণে রুমকী কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললো—"মাত্র পনের পয়সা আছে। এসপ্ল্যানেডে যাবো আমরা।"

"দশ টাকার দুটো নোট ছিল, হারিয়ে গেছে—" বুলবুলি যোগ করলে।

"পয়সা না থাকে, নেমে যান—" কণ্ডাক্টর বিরক্তস্বরে বলে !

পেছন থেকে কে একজন টিপ্পনী কাটে—"এই বয়সেই কেমন ভাঁওতা দিতে শিখেছে দেখ।" দু'একজন হেসে ওঠে। রুমকীর চোখ ফেটে জল আসে। বুলবুলি অবশ্য অত ঘাবড়ায় নি। পাশের এক বুড়ো ভদ্রলোককে বলে—"আমাদের টিকিটটা দিয়ে দেবেন দাদু ? টাকাটা কিন্তু সত্যি সত্যিই হারিয়েছে।"

একটু ইতস্ততঃ করে ভদ্রলোক ওদের টিকিট কাটেন। রুমকী একদৃষ্টে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে—ওর মনে হয় ট্রামশুদ্ধ লোক ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

নিউ মার্কেটের স্টপে নেমে পড়ে ওরা। কিন্তু কয়েক পা গিয়েই বুলবুলি বলে—"এই যা, ভুল হয়ে গেছে।"

"কী হলো ?"

"রোববার তো নিউমার্কেট বন্ধ। একদম মনে নেই—"

অতএব নিউমার্কেটও দেখা হয় না। রুমকীর

মনে হয়, দিনটাই মাটি হলো। কে যেন মনের মধ্যে বলতে থাকে—"খুব হয়েছে। তুমি না ভেবেছিলে মাকে ঠকাবে? এখন নিজে ঠকলে তো?"

বুলবুলি বলে—"ইস—যদি আমিও কিছু পয়সা নিয়ে বেরুতাম! যাক্ যা হবার হয়ে গেছে। বার কর সেই পনের পয়সা। মশলা-মুড়ি খাই দু'জনে।"

পনের পয়সার মশলা-মুড়ি ভাগাভাগি করে খায়। কিছুক্ষণ এসপ্ল্যানেড-এর ময়দানে ঘোরাফেরা করে। রুমকী বলে—বাড়ি ফিরবো কি করে রে?"

"চল, ট্রামে বা বাসে উঠে পড়ি। কেউ না কেউ টিকিট কেটে দেবে।"

"না, ওভাবে আমি যেতে পারবো না—," রুমকী দৃঢ়স্বরে বলে। "চল্ হাঁটি—"

"ভবানীপুর পর্যন্ত হাঁটবি? তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে রুমকী?"

জবাব দেয় না। হন হন করে হাঁটতে থাকে। অগত্যা বুলবুলিও।

পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে এসে লাল আলোতে দাঁড়াতে হয় ওদের। সারি সারি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ বুলবুলি এক কাণ্ড করে বসে। সারিতে দাঁড়ানো দ্বিতীয় গাড়িটার সামনের সিটে বসেছিলেন হাসি হাসিমুখের এক ভদ্রলোক। বুলবুলি ওঁর কাছে গিয়ে বলে—"আমাদের একটু লিফ্‌ট্ দেবেন? ভবানীপুর পর্যন্ত? আমাদের পয়সা হারিয়ে গেছে। ট্রামবাসে যেতে পারছি না।"

গাড়ির পেছনের সিটে বসেছিলেন জাঁদরেল চেহারার এক ভদ্রমহিলা,—বলে ওঠেন—"ও মা, কোন্ যুগে এ সব উপদ্রব শুরু হলো দেখছি।"

ঠিক তখনই লাল আলো হলুদ হয়ে যায়—গাড়িগুলো স্টার্ট দিতে শুরু করে। —ছাড়বার লক্ষণ দেখায় না। অগত্যা ভদ্রলোক গাড়ির পেছনের দরজা খুলে দিয়ে বলেন—"উঠে পড় চটপট—"।

দু'বন্ধুতে উঠে পড়ে পেছনের সিটে। যাক্ বাড়ি ফেরার সমস্যাটা মিটল। কিন্তু না, সেই জাঁদরেল চেহারার ভদ্রমহিলা অত সহজে ছাড়বার পাত্রী নন। ওদের দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলেন—"বাড়ি থেকে পালিয়ে যাচ্ছ না তো?"

"বা রে, বাড়িই তো যাচ্ছি। বললাম যে, ভবানীপুর—"

"বললেই তা সত্যি হয়ে যায় নাকি? তোমাদের বাড়ি তো শ্যামবাজারও হতে পারে। আজকালকার মেয়েরা সব পারে। বলি, পড় কোন্ স্কুলে? না সে বালাই নেই?"

ওরা গোখেল মেমোরিয়েল স্কুলে ক্লাস এইটে পড়ে শুনে ভদ্রমহিলা বলেন—"ও-মা, আমার বন্ধু অনিলাই তো তোমাদের ম্যাথামেটিক্স্ পড়ায়, না? বলতে হবে, অনিলাকে ওর ছাত্রীদের কীর্তি। চেনা জানা নেই—একজনের গাড়িতে উঠে পড়লে। নেহাৎ ভাগ্য তোমাদের ভালো তাই আমরা আছি—যদি কোন বদলোক থাকতো?"

অনিলাদি ভীষণ কড়া আর বদমেজাজী টিচার। কাঁদো কাঁদো স্বরে বলে রুমকী—"অনিলাদিকে বলবেন না প্লীজ।"

সামনের সিট থেকে ভদ্রলোকটি বলে ওঠেন—"আহা থাক না, বেচারাদের ভয় দেখিয়ে কী হবে—"

কিন্তু ভদ্রমহিলা শুনলেন না। সারাটা পথ বক্-বক্ করে উপদেশ দিয়ে চললেন।

ভবানীপুর এসে ভদ্রলোক বললেন—"তোমাদের বাড়ির রাস্তার নাম আর নম্বর বলো।"

বুলবুলি বলে—"আমাদের ট্রামরাস্তায় নামিয়ে দিয়ে যান না—"

"না, না, সন্ধ্যে হয়ে গেছে,—তোমরা ছেলেমানুষ—"

প্রথমে বুলবুলিকে নামিয়ে তারপর রুমকীর বাড়ির সামনে আসেন ওঁরা। নামবার মুখেও ভদ্রমহিলা উপদেশ দিয়ে চলেন—"এর পর আর এভাবে একা একা বেড়িও না, বুঝলে? এসপ্ল্যানেড হচ্ছে সব বদলোকের আড্ডা

বাড়ি এসে যখন কলিং বেল টেপে রুমকী, তখন ওর মাথাটা যন্ত্রণায় ছিঁড়ে পড়ছে। কে জানে, মা কেমন আছে—উঠে দরজা খুলতে পারবে কি না। সরলা নিশ্চয়ই এতক্ষণে চলে গেছে। কিন্তু দরজা খুললে অবাক হয়ে যায় রুমকী। ও মা! দাদু কখন এলেন।

দাদু চেঁচিয়ে বলেন—"বন্দনা, এই যে রুমকী ফিরেছে—"

"রুমকী-রুমকী, কোথায় গিয়েছিলে তুমি?" শোবার ঘর থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসে মা।

"আমি-আমি তো ম্যাক্সি কিনতে—" বলতে গিয়েও থেমে যায় রুমকী। ওর মনে হয়ে যায় মিথ্যে বলার দরকার নেই আর। টাকাটা সে সত্যিই হারিয়ে ফেলেছে। আশাভঙ্গ আর মন খারাপকে আর চেপে রাখা যায় না। হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে ও —"টাকাটা হারিয়ে ফেলেছি মা"—

"আমরা যা চিন্তায় ছিলাম" দাদু বলে ওঠেন। মা বলে—"টাকা তো তুমি হারাও নি রুমকী। টাকাটা তো নিয়েই যাও নি!"

"অ্যাঁ—"

ঘরে ঢুকে রুমকী দেখে, সত্যিই তো—ড্রেসিং টেবিলের ওপর পাউডারের কৌটো চাপা দেওয়া দুটো দশ টাকার নোট।

তখন শুরু হয় আরেক প্রস্থ কান্না। কিন্তু এ কান্না রাগের—নিজের ওপরই রাগের। সামান্য ভুলের জন্য মাটি হয়ে গেল জন্মদিনটা।

ওকে কাঁদতে দেখে মা এসে ওর পিঠে হাত রাখে। "কাঁদছ কেন রুমকী। খাবার টেবিলে এসে দেখ, দাদু কী এনেছেন তোমার জন্য।"

মার সঙ্গে খাবার টেবিলে আসে রুমকী। ওমা, এ কী কান্ড! খাবার টেবিলে একটা চকোলেট কেক ওপরে চিনির গোলাপফুল। আইসিং সুগারে লেখা—"হ্যাপী বার্থ-ডে রুমকী"। আর পাশে ঐ প্যাকেটটা কী? এক টানে খুলে ফেলে রুমকী—হালকা গোলাপী সিল্কের ম্যাক্সি একটা।

চোখ বুঁজে ফেলে রুমকী। সবটাই স্বপ্ন নয় তো? সত্যি কী ঘটেছে ব্যাপারটা?

চোখ খুলে দেখল, না, স্বপ্ন নয়। ঐ তো কেকটা—তার পাশে ম্যাক্সি। না, রুমকীর জন্মদিনটা তো মাটি হয় নি।

দাদুর দিকে ফিরে বলে—"দাদু, আমার সঙ্গে আসবে একটু? বুলবুলিকে ডেকে নিয়ে আসবো? ও বেচারী সারা বিকেল আমার সঙ্গে শুধু শুধু হেঁটেছে। সবাই মিলে কেকটা খাবো তা হলে?"

দাদু বললেন—"চলো—"

দাদুর হাতটা ধরে প্রায় হাওয়ায় উড়ে চললো রুমকী।

গাছ পোকা মাকড় খায়

নিখিল মণ্ডল চট্টোপাধ্যায়

—গাছে পোকা খায়! ব্যাপারটা তোমরা বিশ্বাসই করবে না। কিন্তু ইংল্যান্ড আর আমেরিকায় কয়েক রকমের ছোট ছোট মাংসাশী গাছ আছে। কতকগুলো গাছের পাতা হলদে আর তার উপরটা আঠার মত চট্‌চটে। পাতার রং-এ আকৃষ্ট হয়ে কোনও পতঙ্গ তার উপর বসলেই আটকে যায়। তারপর একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে। পাতাটা আস্তে আস্তে চেপে যায় আর বেচারী দমবন্ধ হয়ে মারা পড়ে। তখন পাতার গা থেকে বেরিয়ে আসে এক রকম জারক রস। সেই রস জারিয়ে পাতা পতঙ্গটাকে দিব্যি হজম করে ফেলে। আর একরকম রাক্ষুসে গাছের পাতার উপর থাকে হাজার হাজার শুঁয়ো। আর সেই শুঁয়োর উপর আঠা টল্‌টল্ করে। পোকা এসে বসলেই শুঁয়োগুলো তাকে জড়িয়ে ধরে মেরে ফেলে। আমেরিকায় আর একটা অদ্ভুত ধরনের মাংসাশী গাছ আছে। এদের পাতাটা ঘটের মতো আর পাতার উপরটা পিছল। পাতার রঙ-এর বাহারে মুগ্ধ হয়ে কোন পতঙ্গ তার উপর বসলেই পিছলে গিয়ে ঘটের তলায় পড়ে। তখন উপরের ঢাকনিটা বন্ধ হয়ে যায়। তারপর কি হয় তা তোমাদের, বুঝিয়ে বলতে হবে না আশা করি। এইসব গাছকে বলে কলস উদ্ভিদ (Pitcher Plant)। যে সব গাছ কীট পতঙ্গাদি খেয়ে জীবনধারণ করে তাদের মধ্যে টিজেল, নেপেন্থিজ, ভিনাস, ফ্লাইট্র্যাপ প্রভৃতি প্রধান।

আমার কিশোর কিশোরী বন্ধুর দল,

ভেবেছিলাম—এমাসে তোমাদের চিঠি লিখবো—দশভুজা মহামায়ার দশ দিক আলোকরা রূপের বর্ণনা দিয়ে। এই দুর্গাপূজায় তোমরা কি কি নতুন পোশাক কিনলে, কোথায় বেড়াতে গেলে—; কোন নতুন বই পড়ে তোমরা আনন্দ লাভ করলে।

কিন্তু সব কিছু ডুবিয়ে ভাসিয়ে—মানুষকে নিরাশ্রয় করে দিল—বন্যা—বন্যা—বন্যা !!

রাক্ষসী সর্বগ্রাসী উত্তাল ডাকিনীর মতো ধেয়ে এলো অকল্যাণকর বন্যা পশ্চিমবঙ্গের বুকে। লক্ষ লক্ষ মানুষকে গৃহহারা আশ্রয়চ্যুত করে দিল এই দুকূল প্লাবিণী সর্বনাশী বন্যা। আলিপুরের আবহাওয়া দপ্তর থেকে ঘোষণা করেছে যে, ১০১ বছরের মধ্যে কলকাতার বুকে এমন বৃষ্টিপাত হয় নি।

কলকাতার সব মানুষেরা সব অঞ্চলে জলবন্দী হয়ে পড়েছিল। তারওপর বিদ্যুৎ বন্ধ। অন্ধকারে সবাইকে যেন এক মৃত্যু পুরীতে কাটাতে হয়েছিল। খাদ্য নেই, পানীয় নেই শুধু বৃষ্টির ধারা বরিষণের শব্দ আর চারদিকে রাশি রাশি জল। তিন দিন এই দুঃসহ অবস্থা! সারা শহরে শিশুদের এক ফোঁটা পানীয় জল ছিল না।

তৃষ্ণায় তাদের কন্ঠ অবরুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে -কিন্তু পিপাসা মেটাবার কোন উপায় নেই। সেই দূষিত জমা বন্যার জল ত আর মুখে তোলা যায় না। কলকাতার প্রত্যেকটি বাড়ীতে জল ঢুকে—মানুষকে এমন অসহায় করে তুলেছিল যে, একমাত্র ভগবানের নাম স্মরণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।

তিনদিন ধরে এই দুঃসহ অবস্থা চলেছিল।

তারপর শহরের বুকের জল কমতে সুরু করেছিল।

শুধু শহর কলকাতা অবস্থাই বা বলব কেন—সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে মানুষের দুর্দশার অন্ত ছিল না।

মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগণা জেলাগুলি বৃষ্টি ও বন্যার জলে ভেসে গিয়েছিল। মাটির ঘর আর কুটিরগুলি বন্যার তোড়ে কোথায় যে ভেসে গিয়েছিল—কেউ তার সন্ধান রাখে না।

লক্ষ লক্ষ মামুষের অনাহারে অনিদ্রায় আশ্রয়চ্যুত হয়ে গাছের ডালে, উঁচু পোড়ো বাড়ীতে, বিদ্যালয়ে কিম্বা নৌকায় সাময়িক ভাবে মাথা বাঁচাতে পেরেছিল। কিন্তু আশ্রয়হারাদের তুলনায় সে ক'জন? কত অবস্থায় মানুষ বন্যার জলে ভেসে গিয়াছে,—কত গৃহপালিত পশু—গরু, মহিষ, হাঁস, মুরগী যে ভেসে গিয়েছে—তার আর সীমা-সংখ্যা নেই। দেশ জুড়ে কত ফসল নষ্ট হয়েছে।

এই রকম প্রলয়ের বন্যা আমাদের দেশে বহুকাল আসে নি। মানুষকে একেবারে চারদিক থেকে সর্বহারা করে দিয়ে গেছে।

সাহায্য এসেছে সরকারের পক্ষ থেকে, স্থানীয় সরকার আর কেন্দ্রের সরকার এগিয়ে এসেছেন ত্রাণ কার্যে। অর্থ দিয়ে, সামর্থ্য দিয়ে, নৌকো দিয়ে হেলিকেপ্টার দিয়ে, বস্ত্র ও আহার্য দিয়ে তাঁরা এখনো সাহায্য করছেন। ভারত সেবাশ্রম সংঘ, রামকৃষ্ণ মিশন, কাশী বিশ্বনাথ সেবা সমিতি আরও বহু বেসরকারী প্রতিস্ঠান মানুষের এই বিপদে এগিয়ে এসেছেন—গ্রহণ করেছেন স্বামী বিবেকানন্দের মহান বাণী—"যত্র জীব তত্র শিব।" ত্রাণ কার্য এখনো পুরোদমে চলছে। সেনাবাহিনীও ত্রাণ কার্যে এগিয়ে এসেছে!

তবু বলব মানুষের দুর্গতির সীমা নেই—শেষ নেই! এবার নিরানন্দ মহামায়ার—পুজোয় তাই বিশ্বকবির বাণী স্মরণে জাগছে—

"দুয়ারে যদি থাকে দাঁড়াইয়া ম্লান মুখে বিষাদে বিরস—
তবে মিছে সহকার শাখা—তবে মিছে মঙ্গল কলস।"

ইতি—তোমাদের বন্ধু—

স্বপনবুড়ো

[স্থানাভাবে এবার চিঠির জবাব দেওয়া হলো না। আগামী মাসে দেওয়া হবে।]

ধাঁধার

গল্প

পিগমি আর টুগমি

রত্নাকর

রাত আটটা না বাজতেই পিগমি লাল লাল চোখে হাত কচলে বলল, 'মা আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।'

কথা শেষ হবার আগেই টুগমি ওদিকে ঢুলতে শুরু করেছে। ব্যাপার দেখে মা বললেন, তোমাদের এত ঘুম তো ছুটি পাওয়ার জন্যে—তোমাদের আমি খুব চিনি। যাও, ছুটি—ও ঘরে গিয়ে এবার ওই সব ভুতুড়ে খেলা শুরু করে দাও। বলার অপেক্ষা, বই গুছিয়ে পিগমি টুগমি তৈরি। মা বললেন, 'বাপি ফিরে না এলে কিন্তু খাওয়া হবে না, ঘুমিয়ে পড়ো না যেন আবার।'

ঘুম? এক লাফে দুজনে এসে বসল মুখোমুখি দুটো চেয়ারে। হাতে কাগজ, পেন রেডি।

কি হবে বলো ত এবার? জানো না?

ও মা, তাহলে তোমরা দেখছি সত্যিই চেনো না পিগমি টুগমিকে।

পিগমি টুগমি দুই ভাই। পিগমি যখন হয়, তখন এত ছোট হয়েছিল যে বাপি ওর নাম দিয়েছিলেন পিগমি। ভাই যখন হল, তখন মিল করে তারও নাম হয়ে গেল টুগমি। ওদের বাবা জাঁদরেল পুলিস-অফিসার—কখন বেরোন, কখন ফেরেন ঠিক নেই, তাই বেশির ভাগ সময় মা-ই সামলান ওদের। অবশ্য সামলাবার খুব দরকার হয় না। নাম শুনে ওদের যে-রকম দুরন্ত মনে করছো, ওরা কিন্তু আদৌ তা নয়।

ওদের কেবল একটিই খেলা। হ্যাঁ, একটিই খেলা, একটিই নেশা, একটিই আনন্দ, একটিই সব!

সেটা হল ধাঁধা।

রাজ্যের যতসব বিদঘুটে ধাঁধা ওদের মগজে গিজগিজ করছে। যেখানে যা পাবে, জুটিয়ে আনবে আর দুই ভাই-এ বসে যাবে মুখোমুখি, কে ক'টা পারে।

না বিশ্বাস হয় দেখো, ওই তো পাশের ঘরে কেমন গম্ভীরমুখে বসে আছে দুজন।

পিগমি বলছে, 'প্রথমে তোকে একটা ছড়ার ধাঁধা জিগ্যেস করি, বল তো—

তোমায় ডাকে, আমায় ডাকে
সবাইকে সে ডাকে—
কাছে গেলে তোমার আমার
নিখুঁত ছবি আঁকে।

টুগমি দুচারবার চোখের পাতা পিটপিট করে বলল, 'বুঝতে পেরেছি। দাঁড়া, কাগজে লিখে রাখছি উত্তরটা।'

খস খস করে উত্তর লিখে সে বলল, 'তোকেও তা হলে একটা ছড়াই জিগ্যেস করি, তুই বল দেখি—

ঢক ঢক গেলে আর শুধু বমি করে;
তাইতেই কি আদর, থাকে ঘরে ঘরে!'

একটুখানি থমকে গিয়ে পিগমি হঠাৎ ফিক করে হেসে ফেলল, বলল, 'এটা মন্দ বানাস নি। দাঁড়া, লিখে রাখছি উত্তর। এবার বল কি চাস, ছড়া না অন্য কিছু?'

টুগমি বললে, 'আমার একটা গল্পের মতো ধাঁধা মনে এসেছে, তুই ওই রকম কিছু বল।'

'শোন তা হলে। সেদিনটা ছিল একেবারে ঘোর অমাবস্যা। আকাশে চাঁদ নেই, তারা নেই, রাস্তায় কোথাও একটা আলো পর্যন্ত জ্বলছে না। একটা মটর

সাইকেল হু হু করে ছুটে আসছে রাস্তা দিয়ে—তারও হেডলাইট নেবানো। একটা কালো কুচকুচে কুকুর রাস্তা পার হচ্ছিল। মটর-সাইকেলটা ঠিক সেখানে এসে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেল, অথচ কুকুরটা একবারও ডাকে নি। বল তো কুকুরটাকে মটর-সাইকেলের লোকটা দেখতে পেল কি করে?'

টুগমি ভুরু কোঁচকাল। চোখ বুঁজে কি যেন ভাবতে লাগল। হঠাং ওর মুখচোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বলল 'যা ব্বাবা, এই ব্যাপার? বুঝতে পেরেছি। দাঁড়া, উত্তরটা লিখেই তোকে আমারটা বলছি।'

আধ মিনিট পরে টুগমি বললে, 'শোন তবে আমারটা। কলকাতায় চৌরঙ্গীর মোড় আছে জানিস তো, সেখানে একদিকে লাল আলো জ্বলছে। ট্র্যাফিকের সেই আলো দেখে ট্যাক্সি, লরি, টেম্পো, বাস সব দাঁড়িয়ে গেছে পর পর। হঠাং দেখা গেল, একটা ট্যাক্সি-ড্রাইভার লাল আলো দেখেও থামল না, সোজা রাস্তা পেরিয়ে চলে গেল। পুলিস তাকে দেখল, কিন্তু কিছু বলল না। কেন বল তো?'

'দেখল?'

'হুঁ।'

'দাঁড়া দাঁড়া, আর একবার বলতো'—

'উঁহু, আর বলা যাবে না।'

'তা হলে'—পিগমি টক টক করে টোকা মারতে লাগল মাথায়, তারপর হঠাৎ মুখে একটা শব্দ করে বলল, 'এই কাণ্ড! দূর, কি বোকা রে আমি! দাঁড়া, লিখে দিচ্ছি।'

টকাটক উত্তর লিখে পিগমি বললে, 'এবার? অঙ্ক?'

টুগমি বললে, 'অঙ্ক হলে কিন্তু আমাকে সোজা দেখে দিতে হবে।'

'ঠিক আছে, সোজাই দিচ্ছি, বল। বাগানে ফুল ফুটছে, কতগুলো মৌমাছি গুনগুন কর'তে করতে উড়ে এলো সেখানে। ফুলের উপর বসতে গিয়ে তারা দেখল এক একজন একটা ফুলে বসলে একটা মৌমাছি বসবার জায়গা পায় না। আবার দু'জন করে একটা ফুলে বসলে একটা ফুল বাকি থেকে যায়। বল তো কটা ফুল ছিল, আর কটা মৌমাছি ছিল?'

টুগমি একগাল হেসে বললে, 'এই ধাঁধা? আমায় অঙ্কে কাঁচা বলে এত কাঁচা আর ভাবিস না। উত্তর আমার মাথায় এসে গেছে, এক্ষুনি লিখে দিচ্ছি।'

কাগজে উত্তর লিখে টুগমি বলল, 'তোকে যেটা দেব, সেটা কিন্তু দারুণ ধাঁধা। বেশি সময় পাবি না, এক মিনিট।'

পিগমি বলল, 'তুই বলই না আগে।'

'শোন। মা তোকে পুজোর জন্যে সতেরো টাকায় সতেরোটা ফল কিনে আনতে বললেন একরকম আনলে হবে না, তিনরকম ফল আনতে হবে। তুই বাজারে গিয়ে দেখলি, বড় বাতাবি লেবু একটা এক টাকা করে, আনারস একটা তিন টাকা করে আর কলা টাকায় চারটে। বল দেখি, সতেরো টাকায় সতেরোটা ফল কিনতে গেলে কি ফল কটা নিবি?'

পিগমি বললে, 'এই তোর শক্ত অঙ্ক? দাঁড়া, এক্ষুনি করে দিচ্ছি।' কাগজ নিয়ে কি সব বিড় বিড় করতে শুরু করল পিগমি। খানিক পরে টুগমি চেঁচিয়ে বলল, 'এক মিনিট কিন্তু হয়ে গেছে।'

'আমার উত্তরও হয়ে গেছে। লিখে রেখেছি। বল, এবার কি বলবো?'

'দেশলাই কাঠির ধাঁধা।'

'দাঁড়া, তাহলে বাক্সটা নিয়ে আসি মার কাছ থেকে।'

পিগমি সবে উঠে দাঁড়িয়েছে, এমন সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। বাবা ফিরলেন বিষণ্ণ মুখে। একটিও কথা নেই তাঁর মুখে।

পিগমি বললে, 'বাপি কি হয়েছে বলো না!'

বাবা ওর দিকে তাকিয়ে এবার একটু হাসলেন, বললেন, 'সে আর তোমরা শুনে কি করবে? একটা শক্ত কেস এসেছে।'

টুগমি বললে, 'কি কেস বাপি?'

মা বললেন—'দেখছো ক্লান্ত হয়ে ফিরছেন, এখন বিরক্ত করছো কেন?'

বাবা বললেন—'না না, তাতে কি হয়েছে। কিন্তু সে শুনে তোমরা কি করবে?'

'তুমি বলোই না বাপি।'

বাবা চেয়ারে বসলেন, বললেন 'বেশ, জানতে চাইছো যখন শোন। বিহার পুলিস আমাদের খবর পাঠিয়েছে সেখানকার তিনজন মিসট্রেস কলকাতায় বেড়াতে গিয়ে হারিয়ে গিয়েছে তাঁদের নাম মিতা

তন্দ্রা আর বেবী। এদের একজন দু'বছরের জন্য বিলেত গিয়ে ভাল নাচ শিখে এসেছে। আজ সন্ধ্যে বেলায় সেই তিনজনের একজনকে একটা হাসপাতালে পাওয়া গিয়েছে—কিন্তু অ্যাকসিডেন্টে তার মাথা ঠিক নেই, সে বিশেষ কিছুই বলতে পারছে না। কেবল দুটো কথা তার কাছ থেকে জানা গিয়েছে। এক নম্বর, তন্দ্রা আর সেই নাচ-জানা মিসট্রেস নাকি মতলব করেছিল কলকাতার কোন স্কুলে একসঙ্গে চাকরি নিয়ে চলে আসবে। দুই, এই মেয়েটি আর মিতা বিহারে পাঁচ বছর ধরে চাকরি করছে, কিন্তু নাচ-জানা মেয়েটি সেখানে চাকরি করছে বছরখানেক মাত্র। এখন এই মেয়েটি যে কে, সেইটেই হল সমস্যা

পিগমি আর টুগমি সঙ্গে সঙ্গে কাগজ নিয়ে মেঝেয় বসে পড়ল।

পিগমি বলল, 'প্রথমে দেখতে হবে বাপি, তিনজনের মধ্যে নাচ জানা মিসট্রেসের কি নাম। মেয়েটির এক নম্বর কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে, সে তন্দ্রা নয়। দু নম্বর কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে সে মিতাও নয়। তাহলে নাচ-জানা মেয়েটার নাম বেবী।'

টুগমি বলল, 'তুমি বললে, বাপি এই মেয়েটা আর মিতা বিহারে পাঁচ বছর চাকরি করছে। অথচ বেবী সেখানে গিয়েছেই তো মাত্র এক বছর। তা হলে এই মেয়েটি কে ?'

পিগমি বলল, 'নিশ্চয়ই তন্দ্রা।'

বাবা কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে বুকে জড়িয়ে ধরলেন ওদের, বললেন--'তোরা যে এই রকম ক্ষুদে গোয়েন্দা হয়ে উঠেছিস সে তো জানা ছিল না ! দাঁড়া, কালই তোদের জন্যে দারুণ একটা উপহার নিয়ে আসবো।'

মা বললেন—'খুব হয়েছে। এমনিতেই ধাঁধা ধাঁধা করে পাগল, তুমি আর ওদের উৎসাহ দিয়ো না তো। নাও, হাতমুখ ধুয়ে খাবে এসো। এই তোরা আয়।'

'দাঁড়াও মা, এক মিনিট'—পিগমি টুগমি ছুটে এল এ ঘরে। পিগমি বললে, 'দেখি তোর কাগজ।'

টুগমি কাগজ দেখাল, তাতে পিগমির দেওয়া প্রশ্নের উত্তরগুলো এইভাবে লেখা ছিল—

১। আয়না।

২। তখন তো দিনের বেলা।

৩। তিনটে ফুল, চারটে মৌমাছি।

পিগমি বললে, 'বাঃ, তোর বেশ বুদ্ধি আছে। নে, আমারটা দেখ।'

পিগমির কাগজে টুগমির প্রশ্নের উত্তর লেখা ছিল এইভাবে—

১। ফাউন্টেন পেন।

২। ট্যাক্সি-ড্রাইভার, সঙ্গে ট্যাক্সি ছিল না।

৩। লেবু ছটা, আনারস তিনটে, কলা আটটা।

টুগমি বললে, 'নাঃ, তোকে হারানো খুব শক্ত ব্যাপার।'

দুজনেই একসঙ্গে হেসে উঠল এবার।

জেব

দেবরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

ঔরঙ্গজেবের 'জেব' কটা ছিল
জামাতে, বলতে পারিস ?
শুধুই তাকিয়ে বিজ্ঞের মতো
নিরেট মাথাটা নাড়িস !
সাত-শো কুড়িটা 'জেব' ছিল তায়,
ভর্তি ছিল তা মোহরে,
উনআশিজন কেরাণী-সেগুলো
গুণতো প্রহরে প্রহরে।

বিদেশী ভারত প্রেমিক ডেভিড হেয়ার

পিনাকী রঞ্জন কর্মকার

কলেজ স্কোয়ারের নাম যে গোলদীঘি আশা করি তা' তোমরা সকলেই জানো। এই গোলদীঘিকেই ঘিরে এককালে বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণের স্পন্দন শুরু হয়েছিলো। গোলদীঘির উত্তরে রয়েছে বিখ্যাত সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু স্কুল। আর এই গোলদীঘির পশ্চিম দিয়ে প্রসারিত হয়েছে কলেজ স্ট্রীট। যার পশ্চিম পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, হেয়ার স্কুল ও প্রেসিডেন্সি কলেজ। আবার আর একটু দক্ষিণে ওই কলেজ স্ট্রীটের পশ্চিম পাড়েই দাঁড়িয়ে আছে সে কালের নবজাগরণের আর একটি পীঠভূমি—মেডিকেল কলেজ।

এই গোলদীঘিতে একটি আশ্চর্য ব্যাপার তোমরা লক্ষ্য করেছো কী? গোলদীঘির দক্ষিণ পাড়ে রয়েছে একটি কবর! গোলদীঘিতে কবর! কী বিশ্বাস হচ্ছে না তো? তোমরা নিজেরাই এসে দেখে যেতে পারো। কারণ সেটি তো কবর নয়, সেটি ভারতীয়দের কাছে এক তীর্থস্থান—এই স্থানেই চিরনিদ্রায় মহাসমাধিস্থ হয়ে আছেন এক আশ্চর্য মানুষ। যাঁকে বলা যায় ভারতের অন্যতম বিদেশী বন্ধু—মহাত্মা ডেভিড হেয়ার।

ডেভিড হেয়ার দেখতে কেমন ছিলেন সেটি হেয়ার-স্কুলের সামনে যে মূর্তিটি রয়েছে তা থেকেই তোমরা বুঝতে পারবে। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে পলাশী যুদ্ধের বাইশ বছর-পরে অর্থাৎ ১৭৭৫ সালে স্কটল্যাণ্ডে এই মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন।

—হ্যাঁ, ডেভিড হেয়ার মহাত্মাই ছিলেন বটে। তিনি সমস্ত পৃথিবীর মানুষকে আপন বলে জেনেছিলেন এবং গ্রহণ করেছিলেন। স্কটল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করলেও কর্মসূত্রে তিনি এসে উপনীত হলেন ভাগীরথীর পূর্বকূলে হঠাৎ-জাগা কলকাতা শহরে। ডেভিড হেয়ার যখন কলকাতায় পদার্পণ করলেন তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র পঁচিশ। ইনি এখানে এসে শুরু করলেন ঘড়ির ব্যবসায়। কিন্তু তিনি ব্যবসায়ী মাত্র ছিলেন না। ভারতের সংস্কৃতি, ভারতের নরনারী, ভারতের সব কিছুই হেয়ারকে মুগ্ধ করেছিলো। তিনি কিছুদিন ঘড়ির ব্যবসায় করেই তা' ত্যাগ পুরোপুরি ভারতসেবায় আত্মোৎসর্গ করেছিলেন।

সন তারিখ বলে বলে তোমাদের মন বিভ্রান্ত করবো না। তবে জেনে রাখো সে সময়টা খুব আশ্চর্য-জনক। উত্তরবঙ্গ থেকে চলে এসেছেন রাজা রামমোহন রায় তাঁর স্থায়ী কর্মস্থান কলকাতাতে। নানাভাবে শুরু করেছেন তাঁর কর্মযজ্ঞ। রাজা রামমোহন ১৭৭৪ সালের ১০ই মে জন্মগ্রহণ করেন ডেভিড হেয়ারের জন্মের ঠিক এক বছর আগে। ডেভিড হেয়ার ও রাজা রামমোহন দুজনেই চেয়েছেন ভারতের মঙ্গল। সুতরাং এই দুই ভারতপথিকের মিলনে ঘটেছে যেন এক অপূর্ব মণি-কাঞ্চনযোগ। কারণ দুজনেই ছিলেন ভারত-অন্ত-প্রাণ, ভারতপ্রেমিক। এই দুজনের প্রচেষ্টাতেই গড়ে উঠতে লাগলো ভারতের বিভি- সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। বাস্তবিক আজকে ভারত

যে বিষয় নিয়ে গর্ব করতে পারে তার সবগুলির পেছনেই রয়েছে এই দুই মহাত্মার মঙ্গলহস্ত সবচেয়ে বেশী ক্রিয়াশীল। ভারতীয় নবজাগরণের সর্বক্ষেত্রে এই দুই যুগন্ধর পুরুষের স্বাক্ষর নক্ষত্রের অক্ষরে লেখা হয়ে আছে।

গোলদীঘির কাছে ওই যে প্রেসিডেন্সি কলেজ তা' ছিলো একদা হিন্দু কলেজ এবং হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠার মূলে ছিলো হেয়ার এবং রাজা রামমোহনের অগ্রণী ভূমিকা। হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়েছিল ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে। ওই যে মেডিকেল কলেজ দেখছো তার মূলেও ছিলেন ওই বিদেশী মানুষটি।—বিদেশী? না, এখন আর হেয়ারকে বিদেশী বলা যাবে না। মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়েছিলো ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে। হেয়ার ততদিনে হয়ে উঠেছেন পুরোপুরি ভারতীয়। সেই ১৮৩৫ সালে স্যার চালর্স মেটকাফ ছিলেন ভারতের গভর্নর জেনারেল। এই মেটকাফের নামে আজও কলকাতা শহরে দাঁড়িয়ে আছে মেটকাফ হল এবং এই হলেই ছিলো সেই গ্রন্থাগার যা' হয়ে উঠেছে আজকের ন্যাশনাল লাইব্রেরী। এই মেটকাফের আমলেই সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা স্বীকৃতি পেয়েছিলো। তখন অবশ্য মহাত্মা রামমোহন আর ইহজগতে ছিলেন না। এর দু' বছর আগেই বিলাতের ব্রিস্টল শহরে তিনি দেহত্যাগ করেন এই ডেভিড হেয়ারের ভাইয়ের বাড়িতেই। ডেভিডের ভগিনী মেরী এবং ভ্রাতা জন রাজার মহাপ্রয়াণ-কালে তাঁর শয্যাপাশেই ছিলেন। বস্তুতঃ হেয়ার পরিবার মহাত্মা রামমোহনের যে সেবা ও শুশ্রূষা করেছিলেন তা' ভারতের সকলেই কৃতজ্ঞচিত্তে চিরকাল স্মরণ করবে।

তা'হলেই দেখো, ডেভিড হেয়ার একাই নয় তাঁদের পরিবারের সকলেই ছিলেন ভারতগতপ্রাণ। ভারত-বন্ধু ডেভিড হেয়ার সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে সর্বপ্রথম যে কথাটি মনে পড়ে তা' হলো এই যে, তিনি ছিলেন প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ মানবপ্রেমিক কেউ কেউ তাঁকে নাস্তিক বলতেন! তিনি নাস্তিক কিনা জানি না, কিন্তু তাঁর মতো মহৎপ্রাণ ব্যক্তি যে আস্তিকের গুরু হবার যোগ্য, তা' মানতেই হবে। কারণ তাঁর ভগবান কোন অদৃশ্য গোলোকে বিরাজ করতেন না। ডেভিড হেয়ারের প্রত্যক্ষ ভগবান ছিলেন আর্ত, দুর্গত-দুঃখী মানুষ। তাঁর কাজ ছিল আর্ত ও দুর্গত, জনের মধ্যেই। তাঁর গৃহদ্বার ছিল সদা উন্মুক্ত সকলের জন্য বিশেষ করে ওই অসহায় দুঃখী মানুষের জন্য তাঁর ছিল সদাব্রত তিনি হেঁটে হেঁটে বেড়াতেন কলকাতার অলিতে-গলিতে। খুঁজে বেড়াতেন অসহায় নিঃস্ব, সর্বহারা, নিরন্ন মানুষদের। সকল আর্ত-মানুষেরই তিনি ছিলেন পরম আশ্রয়, পরম নির্ভর।

স্বামী বিবেকানন্দ যে বলেছিলেন, দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব, কতকাল আগে ডেভিড হেয়ার তা' তাঁর জীবনচর্যায় দেখিয়ে গেছেন। ছাত্রদের মধ্যে সু-অভ্যাস গড়ে তোলবার সে কী আশ্চর্য চেষ্টাই না ছিলো। কোন নোতুন ছাত্র দেখলেই বা তাঁর কাছে গেলে তিনি সর্বপ্রথম দিতেন উপদেশ দৈহিক পরিচ্ছন্নতার। সে উপদেশ ছাত্রটি মেনে চলছে কিনা তা' দেখবার জন্য তাঁর লক্ষ্যও ছিলো কম না। ছাত্রদের পরিচ্ছন্নতা পরীক্ষা করে দেখবার তাঁর এক অপূর্ব কৌশলও ছিলো—তিনি কী করতেন জানো? করতেন কী, প্রথমেই তিনি দেখতেন কানের পেছনটা। দেখতেন তার কানের পেছনটায় ময়লা জমে আছে কিনা? যদি দেখতেন কানের পেছনে কোন ময়লা জমে নেই, তখন সাহেবের সে কী আনন্দ!

মহাত্মা ডেভিড হেয়ার ভারতের সেবায় এমন নিমগ্ন হয়ে পড়েছিলেন যে মামুলি প্রথায় সংসারযাত্রা-নির্বাহের কোন আগ্রহই তাঁর ছিলো না। আর তাঁর সময়ও ছিলো না। এদেশের মানুষকেই তিনি পুত্র-কন্যা-রূপে গ্রহণ করেছিলেন। এই দেশই ছিলো তাঁর সংসার, তাঁর ধ্যান জ্ঞান।

স্ত্রী শিক্ষাপ্রসারের পেছনেও হেয়ার সাহেবের মঙ্গলহস্ত দেখতে পাওয়া যায়। ডেভিড হেয়ার বাঙ্গালীদের কাছে হয়ে উঠেছিলেন পরমাত্মীয়। স্যার উইলিয়ম কেরী, মার্শম্যান, জোনস, কাউয়েল-এর সঙ্গে ডেভিড হেয়ারও ছিলেন পুণ্যশ্লোক, প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি। যাঁর স্মরণে, মননে ও চিন্তনে পুণ্য হয় বলে ভারতীয়রা অনেকেই তা' মনে করেন।

বাস্তবিক এমন ভারত-প্রাণ-আত্মা ভারতবর্ষে খুব কমই এসেছিলেন। ১৮৪২ সালের ১লা জুন যখন তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে, তখন ঘরে ঘরে যে হাহাকার

উঠেছিলো, নর-নারীনির্বিশেষে ধনী, নির্ধন সমস্ত মানুষ যেভাবে শোকপ্রকাশ করেছিলেন তা' থেকেই—হেয়ার যে দেশবাসীর কাছে কতটা আপন হয়ে উঠেছিলেন তা' বেশ বোঝা যায়। তাঁর শবদেহ নিয়ে যখন শোকযাত্রা বার হয় তখন পরম আত্মীয়-বিয়োগ-ব্যথায় কাতর হয়ে অগণিত মানুষ তাঁর শবানুগমন করেছিলেন। বস্তুতঃ হেয়ারের মৃত্যুসংবাদ শুনে সেকালের কোন বাঙালী অশ্রুসংবরণ করতে পারে নি। প্রথাসিদ্ধরূপে হেয়ারের মৃতদেহ কোন খৃষ্টীয় কবরখানায় স্থানলাভ করে নি হয়েছে। কারণ তিনি ছিলেন ভারতে এবং ভারতীয় নবজাগরণের প্রাণ প

তোমরা যে যেখানেই থাকো তীর্থে এসে নতনম্র নমস্কারে এই জানিও।*

* "আকাশবাণী" বিদ্যার্থীদে পঠিত। বরুকটি "সত্যযুগ" পত্রিকার সে

কর্কট বিভ্রাট

লতিকা চট্টোপাধ্যায়

তুফান এক্সপ্রেস ছুটছিল ঝড়ের বেগে অন্ধকার ভেদ করে। হাত ঘড়িতে সময় দেখলাম রাত দশটা। এতক্ষণে ট্রেনের কম্পার্টমেন্টটা ভালভাবে দেখার সময় পেলাম। হাওড়াতে ভীড়ের চাপে সুযোগ মেলেনি। বৃটিশের আমলের সেকেণ্ড ক্লাস কম্পার্টমেণ্ট খুবই নামী ও দামী। আমরা জনাচারেক যাত্রী ছিলাম। তিনজন বাঙ্গালী ও একজন মাড়োয়ারী ভদ্রলোক।

বাড়ি থেকে খাওয়া সেরে এসেছিলাম, পাশের ভদ্রলোক জিজ্ঞাস করলেন, 'মশাই-এর গন্তব্যস্থল কতদূর' ?

বিছানা খুলতে খুলতে উত্তর দিলাম, 'দেওঘর

ভদ্রলোক বললেন, 'অনেক দূরের রাস্তা, শুয়ে পড়াই ভালো।'

চারজনেই শুয়ে পড়লাম! কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। ট্রেনও আপন মনে ছুটে চলেছে নিদ্রিত যাত্রীদের নিয়ে

'হায়রে, বাপরে মর গিয়া!—হায়রে বাপরে মর গিয়া! - হায়রে……'

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শুনছি। ঘুমের ঘোরে—ঠিক বুঝতে পারছি না কোথায় আছি। এটা সত্যি কোন আওয়াজ না স্বপন দেখছি! আবার ঐ রকম শুনছি। এবার হঠাৎ মনে হ'লো গাড়ীতে ডাকাত পড়েছে। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে এবার খেয়াল হলো ট্রেনেই যাচ্ছি, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

তাড়াতাড়ি সুইচ টিপে জোরালো আলো জ্বালালাম, কিন্তু যা দৃশ্য দেখলাম তাতে চোখ থেকে ঘুম ছুটে পালালো। ভয়ানক ভয় পেয়ে গেলাম আমি। কি করব ভেবে পাচ্ছি না। এদিকে মাড়োয়ার চেঁচিয়ে যাচ্ছেন একভাবে। ত ভুঁড়ির ওপর—একটা কাঁকড়া ঘ আর একটা বেড়াচ্ছে নীচের মেঝেতে চলে।

পাশের ভদ্রলোকের উপস্থিত বু রক্ষা পেলাম। ট্রেণের হ্যাঙ্গা ঝুলছিল। চট করে সে ড়ি থেকে কাঁকড়াটিকে বে

সকলে মিলে মাড়োয়ারী ভ নেই। কামড়াবে না। ওটা আ

খাবার জিনিস শুনে মাড়োয় তো চড়কগাছ, ভুঁড়িতে হাত বোলা 'আপলোগ ইয়ে খাতে হেঁ'? ও

এবার আমরা হেসে উঠি ওর ক ওপর থেকে মাটীর হাঁড়িটা এবার না ওতে আরও কয়েকটা রয়েছে। আমার দেওঘরে আছে, তারা এ জিনিস খেতে খুব তাই তাদের জন্য নিয়ে যাচ্ছি মাটীর ওখানে রান্না করে খাওয়া হবে। হাঁ দিয়ে আটা ছিলো, কিন্তু কর্কট মশাইর বেরিয়ে আসায় এই বিভ্রাট।

বাইরে যে দুটো ছিল, তা হাঁ থেকে ধুতি বার করে হাঁড়ির দিলাম, মাড়োয়ারী ভদ্রলোক ভ লাগলেন, ঐ ভয়ংকর প্রাণ পড়ে।

নরমুণ্ড-শিকারীর দেশে টারজান

ভাস্কর

কথা ঃ [নরমুণ্ড শিকারীর দেশ নিউগিনিতে আইভান দলবল নিয়ে জমি **রতে** এসে শুনতে পেলেন সেখানকার নরমুণ্ডশিকারীরা দু'জন শ্বেতাঙ্গকে **ধরে** রেখেছে। টারজানের সহায়তায় আইভান তাদের উদ্ধার করতে উদ্যোগী **পাহাড়ের** ওপর দেহাতী গ্রামে যাবার পথে তাঁরা দেখতে পেলেন **বাসীরা লম্বা** বাঁশের মাথায় দু'টি নরমুণ্ড নিয়ে হৈ-হল্লা করতে করতে চলে **মনে ভাবলেন**, শ্বেতাঙ্গ দু'জনকে ওরা হত্যা করেছে। টারজান বললো, **পেছনে** গিয়ে এই রহস্যের কিনারা করতে হবে।]

[**ভাদ্র** মাসে প্রকাশিত অংশের পরবর্তী **কাহিনী**]

শকারী আদিবাসীরা পাহাড়ী পথ দিয়ে **উঠতে লাগলো**। টারজান, আইভান **রইলো** অনেকটা পেছনে। পাছে **য়** এজন্যই তারা সন্তর্পণেও চলতে **বশ কিছু** ব্যবধান রেখে।

ছুদূর এগিয়েই একটা সমতল **বটি ঘর** নিয়ে একটা ছোট্ট **সেখানে** গিয়ে থামলো।

ওরা আনন্দ-কোলাহলে এত মত্ত ছিল যে, টারজান ও তাদের দলবলের কোন খবরই জানতে পারলো না। অথবা জানতে পারলেও খেয়াল করলো না।

আদিবাসীরা তাদের অস্ত্রশস্ত্রগুলি এক জায়গায় রাখলো। যে বাঁশের মাথায় মুণ্ড দু'টি ছিল সেই বাঁশ দু'টি পুঁতে রাখলো একটি খোলা জায়গার মাঝখানে। তারপর তার চারদিকে সবাই বসে পড়লো শুরু হয়ে গেল তাদের সভা।